কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

জানুয়ারী ৮৪

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

হাতখরচের টাকা ইউকোব্যাঙ্কে জমিয়েই আমি এই সাইকেল কিনেছি

বন্ধুর কাছ থেকে ধার করা
সাইকেল নয়।
এটা আমার নিজেরই।
সাইকেল কেনার জন্য টাকা জমাচ্ছি
যখন, বাবা বললেন, ইউকোব্যাঙ্কে জমাও
টাকা বেড়ে যাবে তাড়াতাড়ি।
তাই করলাম।
নিজের টাকা, সুদের টাকা।
বেশিদিন লাগে নি। নিজের সাইকেলে
চড়া, বড়ো আরাম।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে,
ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

3য় বর্ষ 9ম সংখ্যা

জানুয়ারী 1984

প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর

সম্পাদক : রবীন বল

সহঃ সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ৯০তম জন্ম-বার্ষিকী আজ সারা দেশে পালিত হচ্ছে। শুধু বিজ্ঞান সাধনায় নয়, বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের অবদান অবিস্মরণীয়, বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রসারের পথিকৃৎ পত্রিকা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান সাধনা। তাঁর জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে এই সংখ্যায় লিখেছেন কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানেরই একজন তরুণ পাঠক।

চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য এই সংখ্যায় প্রস্তুতি-মূলক কিছু আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। আরও কিছু লেখা প্রকাশিত হবে—ফেব্রুয়ারী সংখ্যায়। নতুন বছরে তোমাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় 1
চিঠিপত্র 2
দপ্তর থেকে
কালো ভালুক এবং শীত ॥ সমরজিৎ কর 4
বিশেষ রচনা
আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ ॥ সৌমিত্র মজুমদার 3
নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী : 1983 ॥ তপনায়ণ ঘোষ 9
পড়াশোনা
অঙ্ক নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই ॥ নন্দলাল মাইতি 23
মাধ্যমিক পরীক্ষা : 1984 : সম্ভাব্য : ভৌত বিজ্ঞান ॥ অমরনাথ রায় 29
মাধ্যমিক পরীক্ষা : 1984 : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী :
জীবন বিজ্ঞানের প্রশ্ন ॥ দিনোজকুমার দে 35
পদার্থ বিদ্যার প্রশ্নোত্তর ॥ অলক চক্রবর্তী 49
বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প
একটি তারার জন্ম ॥ সুধাংশু পাত্র 42
কালাহারির প্রান্তরে ॥ শ্যামলী বসু 19
ছবিতে গল্প
বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র ॥ দিলীপ দাস 28
খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 26
জুলে ভার্ণের টোয়েন্টী থাউজেণ্ড লীগ্‌স আণ্ডার দি সী ॥ গৌতম কর্মকার 25
হাবুলের বিজ্ঞান ভাবনা ॥ ধীরেন বল 60
ভানুবাবুর রোবট ॥ উজ্জ্বল ধর 16
মজার ছবি ॥ প্রণব হোড় 31
পশু পাখি কীট পতঙ্গ উদ্ভিদ
পুত্র প্রিয় বংশ : মোহনচূড়া ॥ অজয় হোম 6
কিছু মজার সাপ ॥ বিকাশকান্তি সাহা 15
প্রবাল ॥ বিবেক রায় 38
উপন্যাস
সবুজ বনের গান ॥ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 45
আবিষ্কারের কাহিনী
মাইক্রোস্কোপ ॥ নির্মলকান্তি ঘোষ 37
জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা
হেমন্তের আকাশ ॥ বিমান বসু 12
পৃথিবীর যদি বলয় থাকত ॥ হীরক দাশ 40
আগ্নেয়গিরি ॥ স্বপনকুমার মুখার্জী 6
পৃথিবীর বৃহত্তম হীরক ॥ নির্মলকুমার ঘোষ 18
শল্য-চিকিৎসায় ক্লোরোফর্ম ॥ প্রদীপকুমার দাস 17
হাজার বছর আয়ু ॥ শঙ্কর পাল 22
বুমেরাং ॥ সুশীল আগরওয়াল 8
বিজ্ঞান-সংবাদ 41
জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ 49
মজার খেলা 34
ছোটদের বড় বইমেলা ॥ কিন্নর রায় 52
ছড়া
ছোটদের দপ্তর
হাসি কল ॥ সুধীন্দ্র সরকার 49
নলেজ কুইজের উত্তরদাতাদের নাম 53
নলেজ কুইজ : ডিসেম্বর নলেজ কুইজের উত্তর 58
স্লিপব্রেকিং বেল ॥ তাপসকুমার দাস
শব্দকূট ॥ সৌমিত্র মজুমদার 54
গত সংখ্যার শব্দ কূটের উত্তর 57
পাইরিথিঅক্সিন ॥ শুভাশিস ঘোষ 54
ইলেকট্রিক ফিস ॥ বিশ্বজিৎ সরকার 57
ভেবে ভেবে বল ॥ শুভব্রত রায়চৌধুরী 59
জলার আত্মা ॥ রীতা রায় 55
জেনে রাখ ॥ চন্দন রুদ্র 58
ভেবে ভেবে বলোর উত্তর 53

ছবি এঁকেছেন : অলয় ঘোষাল।

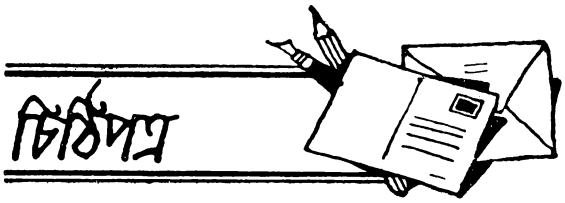

ঘনাদা ক্লাব
ঘনাদা সঙ্গীত

জয় জয় জয় প্রভু ঘনশ্যাম দাস।
তোমা তরে মোরা সবে ক'রি হাঁস ফাঁস ॥
তোমার আকাশ-ভ্রমণ, খাওয়া এটা-ওটা।
বাহারে বাতলা, গুল, নস্যির কৌটা ॥
অরূপ জীবন কথা রাবড়ি-সমান।
যারা শোনে তারা ওগো বড়ো পুণ্যবান ॥
সৌরজগত মাঝে এ রকম প্রভু।
কেউ কোনো দিন আহা দেখেনি তো কভু ॥
এমন প্রভুর কথা যদি কেহ গাহ।
তেমন জীবন পাবে যেরকম চাহ ॥
তাই জয় জয় প্রভু ঘনশ্যাম জয়।
যাহা হ'তে বিঘ্ননাশা, শান্তি লাভ হয় ॥

[পাচালীর সুরে পঠিতব্য]

23. মলয় গোস্বামী কলেজ পাড়া, বনগাঁ

ঘনাদা ক্লাবের সদস্যপদের জন্য যারা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন

24. সুব্রত নস্কর C/o. কানাইলাল নস্কর, গ্রাঃ-পোঃ সীতাকুণ্ডু, P.S. বারুইপুর, 24-পরগণা
25. শুভাশিস ঘোষ, কেশবপুর, হুগলী
26. চিন্তাহরণ রায়, 2নং উড়া কলোনী সাঁকো বর্দ্ধমান, 71310
27. রাজীব দাসমহাপাত্র, মির্জাবাজার, মেদিনীপুর
28. কিংশুক হালদার, এগরা মেদিনীপুর
29. অরূপ মুখোপাধ্যায়, স্বরূপ মুখোপাধ্যায় ডোমজুড়, হাওড়া
30. মলয় ঘোষ, আনারা, নিউ কলোনী পুরুলিয়া
31. শ্যামসুন্দর ও ব্রজগোপাল সাহা পোঃ সোনামুখী, জেঃ বাঁকুড়া 722207
32. দীপ্তাংশু চট্টোপাধ্যায়, C/o. মৃণাল চট্টোপাধ্যায় শ্যামবাবুর ঘাট, পোঃ চুচুঁড়া, জেঃ হুগলী
33. সুব্রত মুখার্জী ও বাবুয়া মুখার্জী আনারা, নিউ কলোনী, পুরুলিয়া
34. ভাস্কর সিনহা, 16/68 আকবর রোড, পোঃ দুর্গাপুর 713204, বর্দ্ধমান
35. পার্থপ্রতিম ঘোষ, 41/50 ওল্ড নিমতা রোড, কলকাতা-56
36. আশিসধবল দেব, সাঁতরাগাছি, হাওড়া-4
37. কুন্তল রায়, হিন্দুস্থান কেব্‌লস, বর্দ্ধমান
38. সুপর্ণা সরকার, প্রণবকুমার সরকার, রুমকি সরকার 24 মল্লিকপাড়া লেন, দমদম কলকাতা-55

হাই ওঠে কেন ?

অক্টোবর-নভেম্বর '83 সংখ্যায় 'শরীর স্বাস্থ্য চিকিৎসা বিষয়ক প্রশ্ন' বিভাগের উত্তরদাতা ডাঃ হেমেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটি প্রশ্নের উত্তরে কিছু বক্তব্য রাখছি। তিনি একটি প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন, 'ঘুম পাওয়া ছাড়া অন্য সময়েও হাই ওঠে। হাই ওঠার বৈজ্ঞানিক কারণ জানা নেই।' কিন্তু আমাদের শরীর যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখনই হাই ওঠে। ঘুমের সময়ও শরীর ক্লান্ত থাকে। কখনো কখনো আমাদের শরীরের রক্তে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয়। তখন অতিরিক্ত কিছু অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণ হয় না, তাই আমরা হাঁ করে মুখ দিয়ে এক সঙ্গে অনেকটা অক্সিজেন গ্রহণ করে ঐ ঘাটতি পূরণ করি। একেই বলে 'হাই তোলা'।

সুভাষচন্দ্র মজুমদার শ্রীপল্লী, বেলঘরিয়া

একই বক্তব্য জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন শিলং-4, লাবান থেকে পঙ্কজ ভট্টাচার্য্য। 40/1, ডাঃ রাজকুমার কুণ্ডু লেন, শিবপুর, হাওড়া থেকে গৌতম কুমার খাঁ এবং সালার (সেখপাড়া), মুর্শিদাবাদ থেকে মকবুল হাসান।

সমীকরণ সমাধানের সহজ পদ্ধতি

গত সংখ্যায় উল্লিখিত সমস্যাটার রহস্য আমি নিজেই ধরে ফেলেছি। হঠাৎ খেয়াল হ'ল, এজাতীয় সমীকরণ-গুলির উভয়পক্ষ থেকে কখনো অজ্ঞাত রাশিকে (অর্থাৎ চল-রাশিকে) ছাঁটাই করে দেওয়া যায় না, এতে উল্টো-পাল্টা মান বেরিয়ে আসে, সব সময় সমাধানও পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে সরল করার পর সরাসরি বজ্রগুণন করে x-এর মান বের করতে হবে।

অসাবধানতাবশতঃ ঠিক এই ভুলটাই আমি করে-ছিলাম, আর তাতেই যতো বিপত্তি! অথচ মজার কথা কী জানেন, বছর দুই আগে আমিই একদিন বন্ধুদের এ ভুলটা শুধরে দিয়েছিলাম। যাইহোক, সত্যিই আমি আন্তরিক দুঃখিত, নন্দলালবাবু যেন কিছু মনে করবেন না।

দেবাশিস কর, ঠাকুর বাটী স্ট্রীট, বল্লভপুর, শ্রীরামপুর হুগলী

বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী-'সত্যেন্দ্রনাথ বসু' 1894-1974

সৌমিত্র মজুমদার

সাধারণ মানুষদের জন্যে যাঁর গভীর সহানুভূতি ও মমতা-র অন্ত ছিলোনা, মনুষ্যেতর জীবের প্রতি যাঁর ভালোবাসার ভাণ্ডার ছিলো অফুরন্ত, সুন্দর ফুলের বাগানের প্রতি তীব্র আকর্ষণ যাঁকে করে তুলেছিলো মহিমান্বিত, সেই পরমপুরুষ ও শ্রেষ্ঠ অন্যতম বাঙালী বৈজ্ঞানিকটির নাম হলো 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু'। 1894 সালের 1 লা জানুয়ারী তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান হচ্ছে উত্তর কলিকাতার পৈতৃক বাড়ী। ওঁর বাবা'-র নাম 'সুরেন্দ্রনাথ বসু' এবং মা'-এর নাম 'আমোদিনী দেবী'। সত্যেন্দ্রনাথ-রা ছিলেন সাত ভাই-বোন। উনি বাবা-মা'-র এক মাত্র ছেলে, বাদবাকি ছয় জন তাঁর বোন। বাবা সুরেন্দ্রনাথের পেশা ছিলো রেলওয়ের হিসেব-রক্ষকের এক অতি সাধারণ চাকরী। ছেলেবেলা সত্যেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম 'নর্মাল স্কুলে' ভর্তি হন, সেখান থেকে আসেন 'নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে'। বিদ্যালয় জীবনের শেষ দিকে তিনি হিন্দু-স্কুলে' ভর্তি হন। ওই 'হিন্দু স্কুল' থেকেই তিনি 1909 সালে 'এণ্ট্রান্স' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শুধুমাত্র উত্তীর্ণ-ই না, অবিভক্ত বাংলাদেশের মধ্যে তিনি পঞ্চম স্থান অধিকারও করেছিলেন। এরপর I. Sc. পড়ার জন্য তিনি 'প্রেসিডেন্সী কলেজে' ভর্তি হলেন। সেই সময় বন্ধু হিসেবে যাঁদের কাছে পেলেন তাঁরা হলেন ভারতলিখ্যাত সর্বশ্রী 'জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ', 'জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী', 'প্রাণকৃষ্ণ পারীজা, প্রমুখ। 1911 সালে তিনি (সত্যেন্দ্র-নাথ বসু) ইণ্টারমিডিয়েট (বিজ্ঞান) বা I. Sc. পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করে তাঁর অসাধারণ মেধার পরিচয় দিলেন। 1913 সনে সম্মানিক গণিতে ও 1915-তে মিশ্র গণিত নিয়ে তিনি M. Sc. উত্তীর্ণ হন। আশ্চর্যের বিষয়, এতেও প্রথম স্থান তিনিই দখল করলেন। 1914 সালে 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু' শ্রীমতী 'উষাবালা দেবীকে' বিয়ে করেন। 1916 সালে স্যার আশুতোষ নবগঠিত বিজ্ঞান-কলেজে মিশ্র গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান—উভয় বিভাগেই সত্যেন্দ্রনাথ-কে অধ্যাপনা করার জন্য আহ্বান করেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তখন ঐ কলেজের 'Chemistry'-বিভাগের সর্বময় কর্তা ছিলেন। 1916 থেকে 1920, এই 5 বছর সত্যেন্দ্রনাথ এই অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। 1924 সালে 'সত্যেন্দ্রনাথ' তাঁর বিশ্ববিখ্যাত 'বোস সংখ্যায়ণ' বিষয়ক গবেষণা-পত্র তৈরী করেন। তাঁর গবেষণাতত্ত্ব সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞার-মহলকে দারুন ভাবে আলোড়িত করলো। তিনি "জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক"—রূপে পরিচিতি লাভ করলেন। এরপর সুদূর 'ইউরোপ'-এর আহ্বানে তিনি ওখানে গেলেন। জার্মানীতে 'আইনস্টাইনে'র অন্তরঙ্গতা লাভ করলেন। এরপর ফ্রান্সে গিয়ে 'ম্যাডাম ক্যুরী'-এর গবেষণাগারে আত্মনিমগ্ন হলেন। 1927 সালে Dacca University'-র অধ্যাপকরূপে তিনি যোগদান করলেন। 1929 সালে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের পদার্থবিদ্যা শাখায় ও 1944 সালে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনের মূল সভাপতি রূপে বৃত হলেন। 1945 সালে তিনি Calcutta University'-র 'খয়রা অধ্যাপক' পদে যোগ দেন। এখানে থাকাকালীন তাঁর একটি গবেগণা 'একক ক্ষেত্রতত্ত্ব' বিজ্ঞানীদের মহলে দারুন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। 1956 সালে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের 'অধ্যাপক' পদ থেকে অবসর নেন। 1959 খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার ওঁকে পদার্থবিদ্যায় জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে বরণ করেছিলেন। তিনি মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্ত পর্যন্ত অজস্র সম্মান কুড়িয়েছেন। প্রতিটি দেশবাসী তাঁকে অসামান্য সম্মান দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। 1957 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টরেট', 1961-তে বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি দিয়ে সম্মান জানিয়েছেন। এলাহাবাদ, দিল্লী, যাদবপুর, ভারতীয় পরিসংখ্যান মন্দির ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মান সূচক 'ডক্টরেট' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। 1954 খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার ওঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দেন। 1958-তে তিনি রয়েল সোসাইটি'-র 'ফেলো' নিযুক্ত হন। 1974 খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে এশিয়াটিক সোসাইটি'-র সম্মানীয় সদস্য-রূপে বরণ করে নেওয়া হয়। একটা দুঃখের কথা, তিনি কিন্তু 'নোবেল প্রাইজ' পাননি। তবে এজন্য তিনি কোনো সময়েই ক্ষোভ কিংবা অভিমান জানাননি। 'নোবেল পুরস্কারের'-র প্রসঙ্গ তুললে তিনি কি বলতেন জানো? তিনি হাসিমুখেই বলতেন, "নোবেল প্রাইজ-ই কি সব? আমার যা পাওনা তাতো পেয়েইছি। ভালবাসা, শ্রদ্ধা, সম্মান, আন্তরিকতা সবইতো পেলাম। এর থেকেও বেশী মূল্যবান জিনিস এ বিশ্বে আর কিছু আছে কি?"

তিনি বিজ্ঞান-সাধনায়, মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রসারে ও মনুষ্যত্বের আদর্শে মহান এক অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ থাকবার পর 1974 সালের 4-ঠা ফেব্রুয়ারী তিনি 80 বছর (আশি বছর) বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

---

73 No. পূর্বাচল পল্লী, রহড়া 24-পরগণা।

কালো ভালুক এবং শীত

সমরজিৎ কর

শীত পড়লে কি কাণ্ডই না তোমরা কর। শীতের হাওয়া শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গায়ে চাপাও গরম জামা কাপড়। আর রাতের দিকে তো কথাই নেই। লেপ মুড়ি দিয়ে শোয়া তো আছেই। যারা দার্জিলিং অথবা কাশ্মীরে বাস করে, তারা ঘরের মধ্যে জ্বালিয়ে রাখে বিদ্যুৎ বা গ্যাসের হিটার। কাঠ কয়লার চুল্লিও জ্বালিয়ে রাখে অনেকে। উদ্দেশ্য আর কিছুই না। আশপাশের বাতাস কিছুটা গরম রাখা। দেহের তাপমাত্রার সঙ্গে পরিবেশের তাপমাত্রার যাতে বেশি পার্থক্য না থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখা। কিন্তু এ কাজ মানুষই করতে পারে, পশু পাখিরা তো আর পারে না। তাই শীত পড়লে যত ফ্যাসাদ তাদের। আর সেই ফ্যাসাদ থেকে নিজেদের বাঁচাতে কত রকম কসরৎ-ই না তাদের করতে হয়।

যে সব পশু পাখি শীতের দেশে বাস করে, বিশেষ করে উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি, বেশি শীত পড়লে, মানে শীতকালে—তাদের অবস্থা দাঁড়ায় আরো সঙ্গীন। ওই সময় গাছের পাতা যায় মরে। নদী বা অন্যান্য জলাশয়ের জল জমে বরফ হয়। তখন তাদের খাদ্যে পড়ে টান। শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বেশির ভাগ পাখি তখন উষ্ণতর অঞ্চলে চলে যায়। পশুরা আশ্রয় নেয় গুহা বা মাটির গর্তে। গায়ের রোম বা পাখনা লেপ বা কম্বলের মত তাদের শরীর গরম রাখতে সাহায্য করে। শরীরের উত্তাপ যাতে সহজে না রোম বা পাখনা ভেদ করে বেরিয়ে যায় তার জন্যে প্রকৃতিই করেছে এমন ব্যবস্থা। অতিরিক্ত শীতে শরীরের ভেতরটা গরম রাখার জন্যে আরো একটি কাণ্ড করে পশুপাখিরা। তোমরাও কর। লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়, শীতের সময় তোমরা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপো। শুধু মানুষই নয়, পশু পাখিরাও কাঁপে। ওই সময় মুহুর্মুহু খিঁচুনি চলে পেশীতে। এর ফলে পেশীর কার্যশক্তি রূপান্তরিত হয় উত্তাপে। এই উত্তাপ দেহকে উষ্ণ রাখতে সাহায্য করে।

হয়ত প্রশ্ন করবে, পেশী কি ভাবে পায় তার শক্তি? এর উত্তরে বলতে হয়, পেশীতে থাকে গ্লাইকোজেন নামে শর্করা যৌগ। আর থাকে ট্রাইগ্লিসেরাইডস নামে আর এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ। এরা আসলে লিপিডস। যা ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসেরল দিয়ে তৈরি। এই সব যৌগের মধ্যে শক্তি থাকে সঞ্চিত অবস্থায়। সেই শক্তিই উত্তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এ ছাড়া প্রাণীদের মধ্যে শীতের সময় এমন সব ব্যাপার চোখে পড়ে যা ভাবলে অবাকই হতে হয়।

যেমন ধরো উত্তর আমেরিকার কালো ভালুক। সাপ বা ওই ধরনের সরীসৃপ প্রাণী শীতের সময় নির্জীব অবস্থায় গর্তের মধ্যে শুয়ে থাকে। গোটা শীতটাই এই ভাবে কাটায় তারা। এদের বলা হয় শীতল রক্তের প্রাণী। তুলনায় কালো ভালুক কিন্তু উষ্ণ রক্তের প্রাণী। কোন কোন স্তন্য-পায়ী প্রাণীও সরীসৃপের মত আচরণ করে। তারাও ঠাণ্ডা রক্তের প্রাণী। যাদের মধ্যে এক শ্রেণীর মেঠো কাঠ-বেড়ালীও পড়ে। নিজেদের স্বাভাবিক দৈহিক তাপমাত্রা 94 ডিগ্রি ফারেনহাইট রাখার জন্যে শীতকালে পর পর কয়েক দিন নিদ্রিত অবস্থায় কাটানর পর তারা জেগে ওঠে। তখন তারা খানাখন্দর ভেতর দিয়ে ছোটাছুটি করে এবং সেই সঙ্গে প্রস্রাবও করে। খাবারদাবারও খায়। প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, কালো ভালুক যেহেতু উষ্ণ রক্তের প্রাণী এ সব ঘটনা তাদের দেহে ঘটা সম্ভব নয়। তারা শীতল রক্তের প্রাণীর মত আচরণ করবে কেন?

দেখা গেছে, এ ধারণা ঠিক নয়। শীতল রক্তের প্রাণীর মত, যখন অত্যন্ত শীত পড়ে, কালো ভালুক তখন নিভৃতে আশ্রয় নেয়। প্রচণ্ড শীতের হাত থেকে আত্ম রক্ষার জন্যে তারা গুহা, মাটির গর্ত অথবা গাছের গুঁড়ির আড়ালে শুকনো লতা পাতার উপর নির্জীবের মত ঘুমোয় মাসের পর মাস। এ সময় তারা কিছু খায় না, এমন কি জলও পান করে না। প্রস্রাবও করে না। সম্প্রতি লিন রোজার্স নামে জনৈক প্রকৃতিবিজ্ঞানী বলেছেন, সে কি যেমন তেমন ঘুম? একটি কালো ভালুককে আমি শীতের সময় এক নাগাড়ে সাতমাসও ঘুমোতে দেখেছি। খাওয়াদাওয়া এবং পায়খানা প্রস্রাব ছাড়া অত দিন কি ভাবে যে সে কাটাল ভাবাই যায় না। অথচ সারা শীতকাল স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয় নি। অত দিন না খেয়ে থাকার পরও তার

শরীর স্বাভাবিকই ছিল। কি ভাবে এটা সম্ভব?

শুরু হল গবেষণা। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, শীতের সময় ওই কালো ভালুকদের দেহে চর্বিও বেশি থাকে না। বেশি চর্বি থাকলে না হয় বলা যেত, সেই চর্বি থেকে যে শক্তি নির্গত হয় তার সাহায্যেই তারা শীতের হাত থেকে নিজেদের বাঁচায়। কিন্তু তা যখন হয় না, ব্যাপারটা কি?

বিজ্ঞানীরা কতকগুলি অদ্ভুত ঘটনা লক্ষ্য করলেন তাদের শরীরে। তাঁরা দেখলেন, তাদের শরীরে চর্বি কম থাকে ঠিকই। তবে পরিবর্তে বেশি থাকে আর একধরনের উপাদান। যার নাম কোলেস্টারল। এবং বেশি বলতে সামান্য বেশিও নয়। অনেকটা বেশি। রক্তে অত বেশি কোলেস্টারল থাকলে শিরা বা ধমনী শক্ত হয়। তা রক্তের সঞ্চালন বাধা পাওয়ার কথা। আর তা হলে মৃত্যুও ঘটা অসম্ভব নয়। অথচ ওই ভালুকদের বেলায় দেখা গেল, অত বেশি কোলেস্টারল সত্ত্বেও তারা বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। বেশি কোলেস্টারল থাকলে পিত্ত থলিতে পাথর তৈরি হতে পারে। এ ক্ষেত্রে তা হয় নি।

তাঁরা আরো একটি ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। শীতের সময় ওই সব কালো ভালুকের দেহে এক ধরনের পিত্ত রস উৎপাদন হয়। যার নাম আরসেডিঅকসিকোলিক অ্যাসিড। এই রাসায়নিক যৌগই তাদের পাথুরে রোগা না হতে সাহায্য করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, যে সব লোক এ ধরনের পাথুরে রোগে ভোগে তাদের উপর ওষুধ হিসেবে ওই যৌগ প্রয়োগ করলে পেটের পাথর গলে যায়। অপারেশন করে আর পাথর বের করতে হয় না।

শীতের সময় কালো ভালুকদের কিডনিও কাজ করে খুব ধীর লয়ে। তারা মাসের মাস প্রস্রাব করে না। এ ক্ষেত্রে কিডনিতে ইউরিয়া নামে এক ধরনের বিষাক্ত যৌগের জমার কথা। কিন্তু তাও হয় না। বরং বিশেষ এক পদ্ধতিতে ইউরিয়া রাসায়নিক ভাবে ভেঙ্গে গিয়ে দেয় নাইট্রোজেন। সেই নাইট্রোজেন তাদের দেহে প্রোটিন তৈরি করতে সাহায্য করে। প্রোটিন শীতকালীন নিদ্রার সময় তাদের শরীরের পেশী এবং অন্যান্য কোষকলার ক্ষয় রোধ করে। শক্তির জন্যে ওই সময় খরচ হয় তাদের দেহের সঞ্চিত চর্বি।

গ্রীষ্মের সময় তারা প্রচুর খায়। খাদ্যের মধ্যে বন্য কুল বা চেরি জাতীয় ফল। এই সব খাবার থেকে তাদের দেহ সংগ্রহ করে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট। খেয়ে তারা বেশ মুটিয়ে যায়। তারপর শীত এলে তারা আশ্রয় নেয় গর্তে। অনেক সময় গর্ত প্রায় বরফে ঢেকে যায়। গর্তের মধ্যে থাকে লতাপাতা। তার উপর গুঁটিয়ে নিদ্রা যায় তারা। তখন তাদের দেহে বিপাকীয় কাজ কর্ম চলে খুব ধীর গতিতে। ফলে শরীরে সঞ্চিত খাদ্যেই ওরা বেঁচে থাকে, অনেক দিন না খেয়েই চালিয়ে দেয়। ঘামে কম। প্রস্রাবও করে না মাসের পর মাস। ফলে প্রস্রাব বা ঘামের মাধ্যমে শরীরে উৎপন্ন তাপ বেরিয়ে যেতে পারে না। ঘামের মাধ্যমে যেটুকুও বা যায়, তা খুবই কম। শীতের সময় বাইরের তাপমাত্রা শূন্যেরও কয়েক ডিগ্রি নিচে নেমে যায়। গর্তের ভেতরকার তাপ-মাত্রা তুলনায় কিছুটা থাকে বেশি। শীতকালে তাদের দেহে দেখা দেয় বিশেষ ধরনের লোম। এই লোম তাদের শরীর উষ্ণ রাখতে সাহায্য করে। পিঠ, শরীরের দুই পাশে দেখা দেয় পুরু লোম।

শীতের হাত থেকে বাঁচানর জন্যে প্রকৃতি কত ভাবে যে প্রাণীদের সাহায্য করে, কালো ভালুক তার একটি উদাহরণ। এ কথা আরো অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রেই ঘটে।

নীলকণ্ঠ বর্গ ঃ

পুত্রপ্রিয় বংশ

অজয় হোম

নীলকণ্ঠ বর্গের অন্তর্গত পুত্রপ্রিয় বংশের (উপুপিদি) পাখির সঙ্গে প্রিয়াত্মজ বংশ বা ধনেশের খুব মিল। আভ্যন্তরীন শারীর স্থান ও অস্থির সংস্থানে প্রিয়াত্মজের সঙ্গে তফাৎ খুবই অল্প। পুত্রপ্রিয়দের পা সুষ্ঠুভাবে যুক্তাঙ্গুল নয়। তৃতীয় ও চতুর্থ আঙুল একদম গোড়ায় সংযুক্ত। একটি মাত্র গণকে বাংলাদেশ ও ভারতে দেখা যায়। এদের চঞ্চু খুব লম্বা, সরু এবং গোড়া থেকে সবটা বাঁকা। জিভ খুব ছোটো। ডানা গোল। লেজ লম্বায় মাঝারি ধরনের এবং মাথায় বেশ ভালো ঝুঁটি। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

মোহনচূড়া

শান্তিনিকেতন থেকে সকাল বেলায় কঙ্কালীতলা বা কাণ্ডীদেশে পাখি লক্ষ্য করার নেশায় হেঁটে পাড়ি দিয়ে এসেছি। কঙ্কালীতলা একান্ন পীঠস্থানের অন্যতম। পঞ্জিকায় লেখা আছে দেবী বেদ-বা দেব-গর্ভা, ভৈরব রুরু।

আশেপাশে চারি দিকে পাখির সন্ধানে ঘুরছি। ভাবছি কুরুম্বা-তিলুটিয়ার দিকে যাব কিনা। আকাশের কোণে একটু মেঘের আভাস। হঠাৎ 'ক্ষ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল আশ্বিনেরই আঙিনায়'। ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিলাম এক বট গাছের তলায়। বেশ খানিকক্ষণ ঝরঝর ধারে ঝরিয়ে দিয়ে কোথায় কালো মেঘ যেন পালিয়ে গেল। 'নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা' আবার দেখা গেল।

গাছ তলায় দাঁড়িয়ে আছি। ঝরা পাতা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে আছে। কাছের কোনো গাছ থেকে একটা ফিকে বাদামী পাখি এসে মাটিতে বসল। তার পিঠে ডানায় ও লেজে কালো-সাদা টানা দাগ ঠিক যেমন জেব্রাদের গায়ে থাকে। সরু লম্বা বাঁকানো চঞ্চু দিয়ে একটা ঝরা পাতা ওলটাল। কোনও পোকার শূক বলে মনে হল, সেটা টেনে বার করে খেল। সবচেয়ে অদ্ভুত তার মাথার ঝুঁটি। তাল পাতার পাখার মতো ছড়ানো। মাটি থেকে পোকাটাকে যখন টেনে বার করছিল তখন সেটা গোটানো ছিল। চঞ্চু সমেত সেই গোটানো ঝুঁটিকে মনে হচ্ছিল যেন একটা গাঁইতি, তা দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। হাঁটা চলা দৌড়নো সবেতেই একটা ছন্দ আছে।

পাখিটাকে চিনি। পাখিটার ডাক অনুকরণ করে ইংরেজি নামটাই বাংলায় চালু। নামটা আমার পছন্দ নয়। সুসাহিত্যিক বনফুলের দেওয়া নামটিতেই একে মানায় ভালো। পাখিটার সৌন্দর্য ও রকম সকম দেখতে দেখতে মনে পড়ল পুরোনো এক কাহিনী।

কথিত আছে, রাণী শেবা রাজা সলোমনের মনোহরণ করতে অনেক উপহার পাঠিয়েছিলেন। নানাবিধ উপঢৌকনের মধ্যে রাজা সলোমনের এই পাখিটিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছিল।

রাজা সলোমন ও এই পাখি নিয়ে আরও একটি উপাখ্যান আছে। রাজা বিক্রমাদিত্যের মতো ডেভিডের পুত্র রাজা সলোমনও ছিলেন বেতালসিদ্ধ এবং পশু পাখির ভাষা জ্ঞান ইত্যাদি যাবতীয় ভৌতিক ও আধিভৌতিক ক্ষমতা সম্পন্ন।

একদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙতে রাজা সলোমনের ইচ্ছে হল তাঁর সীমাহীন রাজ্যের কী অবস্থা তা দেখার। তিনি একটা বড়ো কার্পেটের উপর তাঁর হাতির দাঁতের সিংহাসনটি চাপিয়ে মনে মনে স্মরণ করলেন তাঁর চারজন আজ্ঞাবহ অশরীরী প্রেত বা বেতালদের। তারা হাজির হতেই রাজা আদেশ দিলেন কার্পেটের চারকোণ ধরে সিংহাসন সমেত তাঁকে নিয়ে দেশদেশান্তরে ভ্রমণে যেতে।

বেলা বাড়তেই সূর্যের তেজ প্রখর হল। মাথা ঢাকবার কিছু সঙ্গে আনা হয় নি। ছত্রধারীও সঙ্গে নেই। সূর্যদেব যেন ইচ্ছে করেই রাজাকে জব্দ করার জন্যে তেজটা বাড়িয়ে দিলেন। রাজার ঘাড় পিঠ মাথা পুড়ে যাবার দাখিল। উপায়ান্তর না দেখে আকাশ পথে উড়ে যাচ্ছিল এক ঝাঁক শকুন, তাদের ডেকে রাজা বললেন তাঁর মাথার উপর দিয়ে উড়তে, যাতে সূর্যের তেজ তাঁর সিংহাসন সহ কার্পেটকে স্পর্শ করতে না পারে। শকুনরা জবাব দেয় তারা তাঁর কথা রাখতে পারবে না, কারণ তাদের গন্তব্য পথ সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। রাজাজ্ঞা অমান্য করায় রাজা তাদের অভিসম্পাত দেন, কিন্তু সে অন্য গল্প।

এদিকে রোদের তেজে রাজা অস্থির হয়ে উঠেছেন। এমন সময় দেখলেন একটি ছোটো দলে কয়েকটি ছোটো পাখি উড়ে যাচ্ছে। রাজা তাদেরও ডেকে বললেন মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে, সূর্যের কিরণে তাঁর যাতে কষ্ট না হয়। ওই পাখির দলে ছিল ওদের রাজা। সে

জবাব দিল, তারা মাত্র ক'জন। তবে ওই ক'জনেই যতটা পারে আড়াল করছে। আর খবর নিয়ে বিশেষ দূত যাচ্ছে যাতে অবিলম্বে তাদের গোটা জাতটা এসে হাজির হয়।

কিছুক্ষণের মধ্যে সেই পাখির ঝাঁককে ঝাঁক এসে মেঘের মতো আকাশ ছেয়ে ফেলল। রাজা আর সূর্যতাপে কষ্ট পেলেন না। দেশভ্রমণের পর হাতির দাঁতের তৈরি প্রাসাদে ফিরে এসে রাজা পাত্রমিত্র নিয়ে সোনার রাজ-সিংহাসনে বসলেন। সেই প্রাসাদের দরজাগুলি পান্না-খচিত, জানালা হীরের। এক-একটা হীরে কোহিনূরকেও হার মানায়। রাজার হুকুমে সেই পাখির রাজা রাজসমীপে দণ্ডায়মান হয়। সসাগরা পৃথিবীর রাজা সলোমনের প্রতি এমন আনুগত্য এবং বশ্যতা স্বীকার করার জন্যে অত্যন্ত প্রীত হয়ে তিনি কোনও বর দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

ওই ছোট্ট পাখিরাজ হঠাৎ এভাবে সম্মানলাভে খুবই মুশকিলে পড়ল। সে কি বর চাইবে তা ভেবে পায় না। শেষে ডান পা বুকে ঠেকিয়ে ঘাড় হেঁট করে জবাব দেয়, 'মহারাজ! চিরজীবী হউন! আপনার এই অধম ভৃত্যকে অন্তত একদিন সময় দিন, তাহলে সে গিয়ে তাদের জাতের কি প্রয়োজন তা তার রানী এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে আসতে পারে।' রাজা সলোমন বললেন, 'তথাস্তু'।

পাখিরাজ উড়ে গিয়ে সমস্ত ঘটনা প্রথমে তার বুদ্ধিমতী সুন্দরী রানীকে ব্যক্ত করে পরামর্শ চাইল কি করা উচিত। রানীকে ভাবতে দিয়ে গাছের ডালে সপারিষদ মন্ত্রণা সভা বসিয়েও কিছুই স্থির হল না। কেউ বলে, খুব লম্বা লেজ চাওয়া যাক। কারুর মত, আমাদের পালক নীল আর সবুজ হোক। এক মন্ত্রী বলে, উটপাখির মতো বড়ো হওয়ার বর চাইলে মন্দ হয় না। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কিছুই স্থির হয় না। কারুর সঙ্গে কারুর মতের মিল হল না। কোনও সিদ্ধান্তে যখন আসা গেল না, তখন পাখিরানী রাজাকে ডেকে বলে, 'মহারাজ, আমার কথা শুনুন। রাজা সলোমনের মাথা যখন সূর্যতাপ থেকে আমরা বাঁচিয়েছি, তখন আমাদের প্রত্যেকের মাথায় সোনার মুকুট হোক এই বর চাওয়া যাক; তাহলেই আমরা সমস্ত পক্ষিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হব এবং তার ফলে হব পাখিদের সম্রাট।'

রানীর এই যুক্তি সকলেরই খুব পছন্দ হল। পরদিন সকালে সেই ছোট্ট পাখিরাজ রাজা সলোমনের দরবারে গিয়ে তার প্রার্থনা জানাল। রাজা সলোমন মৃদু হেসে বললেন, 'খুব বুঝে শুনে চিন্তা করেই স্থির করেছ তো?' পাখিরাজ খুব বিনীত হয়ে বলে, 'হ্যাঁ মহারাজ! আমাদের সকলেরই খুব ইচ্ছে আমাদের মাথায় সোনার মুকুট হোক।' জবাবে সলোমন বলেন, 'সোনার মুকুট তোমাদের সকলের মাথাতেই এই মুহূর্তে হোক। কিন্তু তুমি একটি গণ্ডমূর্খ। এই বরের ফলে যখন তোমাদের উপর অভিসম্পাত নেমে আসবে এবং অদূর ভবিষ্যতে সেটা আসবেই, উপায়বিহীন হয়ে নিজেদের মূর্খামির কথা মনে পড়বে, তখন কিন্তু আমার কাছে আসতে দ্বিধা করো না। আমি তোমাদের সাহায্য করব, বিপদ থেকে মুক্ত করব।'

ছোট্ট পাখিরাজ নিজের আস্তানায় ফিরে এসে দেখে তাদের সকলের মাথায় সোনার মুকুট বসে গেছে। এর ফলে তারা ক্রমে অত্যন্ত অহঙ্কারী ও দুর্মুখ হয়ে ওঠে। নিজেদের রূপ দেখবার লোভে খালি ঘুরে বেড়ায় নদী পুকুর হ্রদের ধারে ধারে। আয়নার বদলে জলের ছায়ায় মুখ দেখে নিজেরাই আত্মহারা হয় আর গর্বে ফুলে ওঠে রানী তো গরবে আর বাঁচে না। অহঙ্কারে ফেটে পড়ে। কারণ, তার বুদ্ধিতেই আজ সবার মাথায় সোনার মুকুট। গাছের উঁচু ডালে বসে সকলকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে থাকে। এমনকি জ্ঞাতি শার্ঙ্গবংশের বাঁশপাতিদের তো যাচ্ছেতাই বলে। সুন্দরী মিষ্টভাষী রানী এখন মুখরা দুর্বিনীতা।

একদিন এক ব্যাধ তার ফাঁদের ভিতর এক টুকরো আয়নার ভাঙা কাচ দিয়ে ফাঁদ পেতেছিল। কী হয় তাই দেখার বাসনাটাই তার ছিল। এদিকে এক সোনার মুকুট পাখি দূর থেকে আয়নার কাচে নিজের রূপে আত্মহারা হয়ে ওঠে। কাছে গিয়ে কিরকম দেখাচ্ছে তাই দেখতে গিয়ে ফাঁদের ভিতর ঢুকে ধরা পড়ে। ব্যাধ জ্বলজ্বলে মাথা দেখে মুণ্ডুটা ছিঁড়ে জেকবের ছেলে তামাপেতলের কাজ করে ইশাচরের কাছে যায়। জানতে চায় এটা কোন ধাতু। ইশাচর জবাবে বলে, ওটা কিছু নয়। পেতলের মুকুট একটা। দাম দেয় পঁচিশ পয়সা। ইশাচর ব্যাধকে বলে আর যদি এরকম পায় তবে যেন সে তার কাছেই নিয়ে আসে। প্রতিদিনই আয়নার ফাঁদে ফেলে বেশ কিছু ওই বোকা অহঙ্কারী পাখিদের ধরে ব্যাধ বিক্রি করে জেকবপুত্র ইশাচরের কাছে।

এইভাবে দিন যায়। হঠাৎ একদিন ইশাচরের বাড়ি যাবার পথে এক সেকরার সঙ্গে ব্যাধের দেখা। কি ভেবে তাকে সেই পাখির কয়েকটা মাথা দেখায়। সেকরা বলে এগুলো মোটেই পেতল নয়, একেবারে খাঁটি গিনি সোনা। সে চারটে পাখির মাথার জন্যে এক মোহর (দিনার) দাম দেয়।

এসব খবর মুখে মুখে হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। সারা ইস্রায়েল জুড়ে শোনা যেতে থাকে ধনুকের টঙ্কার না হয় গুলতির শব্দ। পাখি ধরা সামান্য ফাঁদেরও দাম অসম্ভব বেড়ে গেল। কাতারে কাতারে সোনার মুকুটওয়ালা পাখি মরতে লাগল। যে কটি পাখি বেঁচে রইল তারা আর ভয়ে পাতার আড়াল থেকে মাথা বার করে না। দিনরাত তাদের চোখ দিয়ে জল ঝরে আর রানীকে অভিসম্পাত দেয়। কোনও উপায় না দেখে ওই পাখিদের রাজা গভীর জঙ্গল ও লোকালয়বিহীন জায়গা দিয়ে অনেক ঘুরে আপদবিপদ পার হয়ে রাজা সলোমনের সামনে হাজির হল। দুঃখের কথা বলতে গিয়ে সে কেঁদেই ফেলল। কয়েকটা অব্যক্ত আওয়াজ ছাড়া মুখ দিয়ে আর কিছুই বার হল না।

রাজা সলোমন সব বুঝলেন। দয়া পরবশ হয়ে বললেন, 'সোনার মুকুট বর প্রার্থনার সময়েই তোমার এই মুখ্যুমির জন্যে সাবধান করেছিলাম। তুমি তা শোন নি। অহঙ্কার আর গর্বই তোমাদের এই ধ্বংসের কারণ। যাই হোক, তুমি আমার উপকার করেছিলে সেকথা আমি ভুলি নি। তোমাদের মাথায় সোনার মুকুট আর থাকবে না, এখন থেকে মাথায় পালকেরই মুকুট হবে। সেই মনমুগ্ধকর মোহনচূড়া নিয়ে এখন থেকে বিনা বিপদে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াতে পারবে।' [চলবে]

8/1 ডঃ বীরেশ গুহ স্ট্রীট, কলি-17

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

নিয়মাবলী

এজেন্টদের জন্য

- ১০ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা ২৫ টাকা।
- ভি. পি. বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হবে। ডাক-মাশুল লাগবে না।
- এজেন্টদের অর্ডার অনুযায়ী সংখ্যা পিছু ১ টাকা করে অগ্রিম জমা রাখতে হবে।
- এলাকা ভিত্তিক এজেন্সীর জন্য সাক্ষাতে অথবা চিঠিতে যোগাযোগ করুন।

বুমেরাং

সুশীল আগরওয়ালা

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা বুমেরাং নামে এক ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করত, বা শিকারীরা তাদের শিকারের দিকে ছুঁড়ে মারত, শিকার লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে বুমেরাং ফিরে আসত শিকারীর হাতে।

শুধু অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরাই নয় প্রাচীন-কালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বুমেরাং এর ব্যাপক প্রচলন ছিল।

প্রায় 3500 বছর আগে মিশরে বুমেরাং এর সাহায্যে পশুপাখি শিকার করা হত, যার বেশ কিছু সেদেশের বিভিন্ন মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। দক্ষিণ আমেরিকার হোপী ইণ্ডিয়ানরাও একধরণের বুমেরাং ব্যবহার করত, যার নাম 'পুচকোহেং'। এছাড়া ভূমধ্যসাগরের নিকটবর্তী ইউরোপ ও এশিয়ার কিছু দেশে, আফ্রিকার ইথোপিয়া ইত্যাদিতে বিভিন্ন ধরণের বুমেরাং পাওয়া গেছে, যা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় বুমেরাং প্রাচীন কালে অস্ত্র হিসাবে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল।

এদিকে ইংল্যাণ্ডের বিশিষ্ট বুমেরাং বিশেষজ্ঞ ডঃ পিটার সুসগ্রোড প্রমান করেছেন যে এক সময় ভারত-বর্ষেও বুমেরাং ব্যবহৃত হত।

দক্ষিণ ভারতে কাঠ বা লোহা দিয়ে তৈরী কাটারিয়া নামে একধরণের বুমেরাং ব্যবহৃত হত। এই কাটারিয়ার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া বুমেরাং এর তফাত সামান্যই। বরোদার মিউজিয়ামে কাটারিয়া সংরক্ষিত আছে। তামিলনাড়ুর দ্রাবিড় জাতির লোকেরা তামা ও পিতলের তৈরী বুমেরাং এর সাহায্যে হরিণ শিকার করত। আস্তর নামে এক-ধরণের বুমেরাং এর উল্লেখ আছে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে। এছাড়া বিভিন্ন ঐতিহাসিকের লেখায় বুমেরাং জাতীয় অস্ত্রের কথা বহুবার উল্লিখিত হয়েছে।

এন. এস. রোড রায়গঞ্জ, পশ্চিম-দিনাজপুর

নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী 1983

তপনায়ণ ঘোষ

ডঃ বারবারা ম্যাক ক্লিনটক

1983 সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন আমেরিকার ডঃ বারবারা ম্যাক ক্লিনটক। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার প্রথম সংবাদটি পেয়ে একটি ভুট্টা হাতে ডঃ ম্যাকক্লিনটক দাঁড়িয়ে ছিলেন সাংবাদিকদের সামনে। সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের মুহূর্তটি ধরেছেন এক আলোক-চিত্রী।

এতো কিছু থাকতে হাতে ভুট্টা নিয়ে নোবেল বিজয়ী সাংবাদিকদের সামনে এলেন কেন? এ প্রশ্ন তোমাদের মনে জাগতে পারে। ডঃ ম্যাকক্লিনটক তাঁর গবেষণা শুরু করেন এই ভুট্টা দানা দিয়েই। আর এটা জেনেও তোমরা খুশি হবে তিনি তাঁর গবেষণার জন্য ভারতীয় ভুট্টা (পার পেল এইচ মেজ) গাছ বেছে নিয়েছিলেন।

1902 সালের 16 জুন আমেরিকার কানেটি কাট রাজ্যের হার্ট ফোর্ড শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। এই 81 বছর বয়সের বৃদ্ধা বিজ্ঞানী এখনও নিউয়র্কের কোল্ড স্প্রিং হারবার গবেষণাগারের সংগে যুক্ত রয়েছেন।

জীবজগতের বংশ গতি যে জিনিসটি বহন করে তাকে বলা হয় জিন। জিনকে বংশ গতির একক বলা যায়। জিনের আকৃতি এতো ছোট (এক মাইক্রোজের কুড়ি ভাগের এক ভাগ) যে ভাবনার মধ্যে আনা যায় না। এই জিনের মধ্যে লুকিয়ে আছে আমাদের উত্তর-সুরীর দৈহিক, মানসিক, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বংশগত গুণ, দোষ ত্রুটি এমনকি রোগ পর্যন্ত। এতো সব সত্ত্বেও একই পরিবারে ভিন্ন গড়ন বা ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় কেন? এ প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজে বার করেছেন ডঃ ম্যাকক্লিনটক। দীর্ঘ 35 বছর ধরে তিনি এ বিষয়ে গবেষণা চালিয়েছেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল কোন্ কোন্ জিন দ্বারা হঠাৎ বংশ গতির ধারা পরিবর্তন হয় তা অনুসন্ধান করা। দীর্ঘ দিন ধরে গবেষণা চালিয়ে তিনি প্রমাণ করতে পেরেছিলেন উদ্ভিদের ক্রোমোজোমে কিছু কিছু জিন আছে যারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়, ফলে বংশধরদের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে। এদেরকে 'জাম্পিং জিন' বা 'মোবাইল জেনেটিক এলিমেণ্ট' বলা হয়।

ডঃ ম্যাকক্লিনটকের গবেষণাকে কাজে লাগিয়ে ক্যান্সার কেন বৃদ্ধি পায় তা জানা যেতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। তাঁর আবিষ্কার বর্তমানে উদ্ভিদের উন্নত বীজ ও ফলের ফলন বাড়াতে নানা ভাবে সাহায্য করছে।

ডঃ বারবারা ম্যাকক্লিনটক

ডঃ উইলিয়ম ফাওলার

রয়্যাল সুইডিশ আকাদেমি অব সায়েন্সেস পদার্থ বিদ্যায় 1983 সালের নোবেল পুরস্কার দিয়েছেন দুজন বিজ্ঞানীকে। তাঁদের একজন হলেন ডঃ উইলিয়ম ফাওলার। ডঃ ফাওলারও একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তাঁর সংগে যিনি পদার্থ বিদ্যায় পুরস্কার পেয়েছেন তিনি হলেন ডঃ সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর। অধ্যাপক ফাওলার এখন আছেন মার্কিন দেশের পাসাডেনার ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে। চন্দ্রশেখর ও ফাওলারের গবেষণনার বিষয় অবশ্য আলাদা। চন্দ্রশেখরের বিষয় হলো নক্ষত্রের কাঠামো ও বিবর্তনের ভৌত ধারা ও তার গুরুত্ব। অন্যদিকে ফাওলারের বিষয় ছিল মহাবিশ্বে রাসায়নিক পদার্থ গঠনে পারমানবিক প্রতিক্রিয়া। তবে দুজনের গবেষণা মিলেছে একটি জায়গায় সেটা হলো স্টেলার এভোলিউশন বা সৌর জগতের বিবর্তন।

সুইডিশ আকাদেমি এঁদের পুরস্কার দিতে গিয়ে বলেছেন, এ বিষয়ের ওপর কয়েক শো বিজ্ঞানী কাজ

ডঃ উইলিয়ম ফাওলার

করেছেন বা করছেন! কিন্তু এঁদের দুজনের গবেষণা এর মধ্যে সব থেকে মূল্যবান।

1911 সালে ডঃ ফাউলার জন্ম গ্রহণ করেন। তিনিও মার্কিন নাগরিক।

ডঃ হেনরি টাউবে

রসায়নে এ বছর (1983) নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর হেনরি টাউবে। ডক্টর টাউবে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অজৈব রসায়ন শাস্ত্র বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিভিন্ন পদার্থের অণুর মধ্যে ইলেকট্রন (ঋণাত্মক কণা) বিনিময়ের পদ্ধতি আবিস্কারের জন্য তাঁকে এই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। রসায়নে সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন অধ্যাপক টাউবে। গত 30 বছর ধরে তিনি রসায়নে গবেষণার ক্ষেত্রে পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছেন।

কানাডার মাসকাটুবে 1915 সালের 30 নভেম্বর তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। ওখানকারই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক ও দুবছর পর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পান। এর পর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি লাভ করেন। 1940-41 সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন। 41 থেকে 45 সাল পর্যন্ত কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন। এ সময় তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা গবেষণা কমিটির সংগে যুক্ত ছিলেন। 1946 সালে অজৈব রসায়নের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে ছিলেন 61 সাল পর্যন্ত। 62 সালে স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অজৈব রসায়নের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। এখনও সেখানেই তিনি অধ্যাপনার কাজে রয়েছেন। 1942 সালে মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।

অজৈব রসায়নে তিনি 18টি গুরুত্ব পূর্ণ আবিস্কার করেন। তাঁর এই গবেষণাগুলি তত্ত্বমূলক হওয়ায় তেমন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নি। কিন্তু আধুনিক রসায়নের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করতে তাঁর অবদান অসামান্য। অধ্যাপক টাউবে মার্কিন ন্যাশনাল আকাদেমি অব সায়েন্স, মার্কিন কেমিক্যাল সোসাইটি ও আমেরিকান আকাদমি অব আর্টস এ্যাণ্ড সায়েন্সের সদস্য।

ডঃ সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর

1935 সালের 11 জানুয়ারী। শুক্রবার। লণ্ডনের

ডঃ সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর

রয়্যাল অ্যাস্টোনমিক্যাল সোসাইটির সভায় এক ভারতীয় যুবক বক্তৃতা দেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র 28 বছর। সেই লাজুক যুবকটি সেদিনের সে বক্তৃতায় এক যুগান্তকারী তত্ত্ব বিশ্ববাসীর কাছে হাজির করলেন। ঐ যুবকটির কথা শুনে সবাই থ বনে গেলেন। সেদিনই ঐ যুবকটির পর বক্তৃতা দিতে উঠলেন আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের পথিকৃৎ ও কেমব্রিজ মানমন্দিরের প্রধান স্যার আর্থার স্ট্যানলি এডিংটন। স্যার এডিংটন এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিলেন ঐ যুবকের তত্ত্ব। সেই সভায় উপস্থিত বিদগ্ধ জনেরা হেসে সায় দিলেন এডিংটনের কথায়। ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপে হাস্যাস্পদ করে তুললেন তাঁকে। চূড়ান্ত অপমানে মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল ঐ যুবককে।

সেই যুবক আজ বৃদ্ধ। 19 অক্টোবর যেদিন রয়্যাল সুইডিশ আকাডেমি অব সায়েন্সেস পদার্থ বিজ্ঞানে 1983 সালের নোবেল বিজয়ীর নাম ঘোষণা করলেন সেদিন ঐ বিজ্ঞানী সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখরের 73 তম জন্মদিন। নোবেল পুরস্কারটি যেন সেদিন জন্ম দিনের উপহার হয়ে এসেছিল। পদার্থ বিজ্ঞানে তিনি অবশ্য যুগ্মভাবে এই পুরস্কার পেয়েছেন। সেই যুবকটি আজ 73 বছরের (1983 সালের নোবেল বিজয়ী চন্দ্রশেখর।

মহাকাশে যে লক্ষ লক্ষ গ্রহনক্ষত্র আছে, তাদেরই জন্ম-বৃত্তান্ত আবিষ্কার করেছেন ডঃ চন্দ্রশেখর। জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরা বলেন, ঐ দূরের তারারা দিনরাত জ্বলছে আর আলো দিচ্ছে। এভাবে জ্বলতে জ্বলতে আলো দিতে দিতে একদিন এরা ফুরিয়ে যাবে। তারারা মরে যায় তখন। প্রশ্ন, মৃত্যুর পর কি হয় তাদের? এরই উত্তর দিয়েছেন চন্দ্রশেখর।

তিনি বললেন, অন্য ভাবে তারাদের আবার জন্ম হয়। এই পুনর্জন্ম সম্পর্কে চন্দ্রশেখর বলেন, ধরা যাক একটা তারা যার ভর আমাদের সূর্যের চেয়ে 1·4 গুণ যা 'চন্দ্র-শেখরের সীমানা' নামে পরিচিত। যদি কোন তারা তার থেকে হালকা হয় তবে মৃত্যুর পর তারাগুলি ছোট হতে থাকে। ছোট হতে হতে এক অদ্ভুত ধরনের তারায় পরিণত হয়। ছোট হলে কি হবে তার ভীষণ ওজন। ঐ ছোট তারাদের বলে শ্বেত বামন (হোয়াইট ডোয়ার্ফে)। এই ছোট তারারা কিভাবে হয় অংক কষে ডঃ চন্দ্রশেখর দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এই ছোট্ট তারাগুলো থেকে শাদা আলো বের হতে থাকে। আর এই তারার এক কাপ মাটি যদি তোমাকে দেওয়া হয় তবে তা কিছুতেই ওপরে তুলতে পারবে না। কেননা ঐ এক কাপ মাটির ওজন পাঁচ টনের মতো।

1910 সালের 19 অক্টোবর তিনি মাদ্রাজে জন্মগ্রহণ করেন। কলেজ জীবন কেটেছে মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজে। 1930 সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান পেয়ে এম এ ডিগ্রি লাভ করেন। সেই সুবাদেই সরকারী বৃত্তি পেয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য লণ্ডন যাত্রা। 1933তে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ। 1952 সালে তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতিপদার্থ বিজ্ঞানে প্রধান অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। এখনও তিনি শিকাগোর ইয়ার্কসে গবেষণা করে চলেছেন। তিনি 1953 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।

ডঃ চন্দ্রশেখরের গবেষণা সম্পর্কে আরও কিছু কথা রয়ে গেছে। চন্দ্রশেখর দেখেছেন, যদি কোন তারা সূর্যের চেয়ে 1·4 গুণেরও বেশী ভারী হয়, তাহলে তারাটি বাড়তে বাড়তে এক সময় ফেটে যাবে। তৈরী হবে নিউট্রন তারা কিম্বা 'ব্ল্যাক হোল'।

জেরার্ড ডেবরু

বার্কলি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেরার্ড ডেবরু 1983 সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। অর্থনীতিতে ভার সাম্যতার তত্ত্বের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য রয়াল সুইডিশ আকাডেমী অব সায়েন্সস তাঁকে এই পুরস্কার দিয়েছেন।

1921 সালে ফ্রান্সে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। ফ্রান্সেই তাঁর শিক্ষাদীক্ষা। 1950-এ তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। দু বছর বাদে বার্কলিতে। 1962 সালে তিনি বার্কলি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। 1975 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।

1972 সালে অধ্যাপক ডেবরুর গবেষণার সহকারী হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবিথ এ্যারো নোবেল পুরস্কার পান। তার এগারো বছর বাদে অধ্যাপক ডেবরু এই পুরস্কার পেলেন।

ডঃ জেরার্ড ডেবরু

হেমন্তের আকাশ

বিমান বসু

হেমন্তের উত্তর আকাশে যে তারামণ্ডলটিকে সহজেই চেনা যায় সেটি হলো ক্যাসিওপিয়া (Cassiopeia)। এর বিষয় আগেই বলেছি। কার্ত্তিক মাসের গোড়া থেকেই ক্যাসিওপিয়াকে দেখতে পাবে উত্তর পূর্ব আকাশে দিগন্তের বেশ ওপরে। অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহে ক্যাসিওপিয়া মধ্য গমন করে রাত 9টা নাগাদ। সে সময় উত্তর আকাশে একে দেখায় ইংরেজী অক্ষর 'M'-এর মত।

ক্যাসিওপিয়ার ঠিক দক্ষিণে একসঙ্গে দুটি তারামণ্ডলকে দেখা যায়। একটি পেগাসাস্ (Pegasus), অন্যটি অ্যান্ড্রোমেডা (Andromeda)। পেগাসাস্ একটি বিশাল তারামণ্ডল। গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীতে পেগাসাস্ হলো পক্ষিরাজ ঘোড়া, কিন্তু তারামণ্ডলটিতে সেরকম কোনও আকৃতি চোখে পড়ে না।

পেগাসাস্‌কে চেনবার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো প্রথমেই এর বিশাল বর্গক্ষেত্রটিকে খুঁজে নেওয়া। চারটি উজ্জ্বল তারা নিয়ে তৈরী বর্গক্ষেত্রটির ভেতরের অংশটা

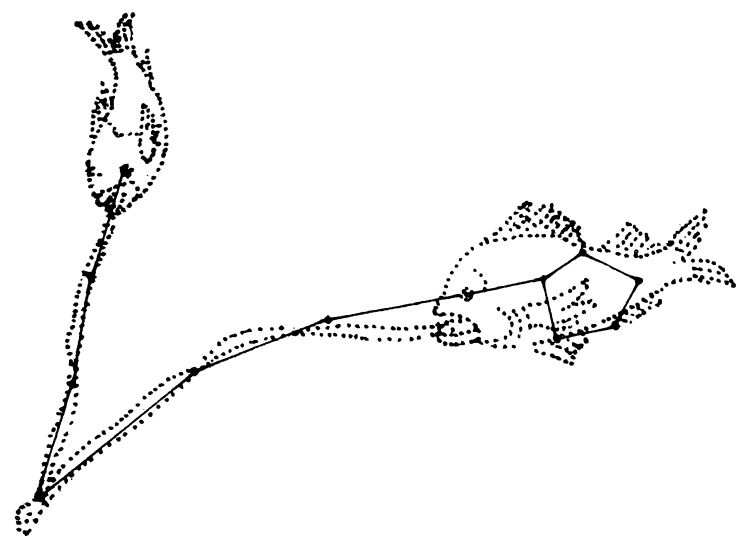

মীনরাশি

একেবারে ফাঁকা সুতরাং চিনতে অসুবিধে হয় না। পেগাসাস্ মধ্যগমন করে 1লা কার্ত্তিক রাত 10টায় এবং 1লা শ্রাবণ ভোর 3টের সময়। ঐ সময় তারামণ্ডলটিকে দেখতে পাবে আকাশে ঠিক মাথার ওপরে।

পেগাসাসে চান্দ্র তিথি সংক্রান্ত দুটি নক্ষত্র রয়েছে। প্রথমটি তারামণ্ডলের ক ও খ তারা দুটি নিয়ে তৈরী নক্ষত্র পূর্বভাদ্রপদা। অন্যটি পেগাসাসের গ ও পাশের অ্যানড্রোমেডার ক তারা নিয়ে তৈরী, নাম উত্তর ভাদ্রপদা।

পেগাসাসের বর্গক্ষেত্রের উত্তর পূর্ব কোণে যে উজ্জ্বল তারাটি রয়েছে সেটিকে আধুনিক মতে অ্যানড্রোমেডা তারামণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়। সেজন্য এটিকে পেগাসাসের খ তারার পরিবর্তে অ্যানড্রোমেডার ক তারা বলে ধরা হয়। ছবিতেও তাই দেখানো হয়েছে।

পেগাসাসের উত্তরপূর্ব কোণ থেকে নিয়ে অ্যানড্রোমেডার চারটি উজ্জ্বল তারা ছড়িয়ে রয়েছে একটা বৃত্তচাপের মত। পৌরাণিক কাহিনীতে অবশ্য তারামণ্ডলটিতে একটি মেয়ের আকৃতি কল্পনা করা হয়েছে।

অ্যানড্রোমেডার সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু হলো বিখ্যাত 'এম-31' নিহারীকা যার দূরত্ব পৃথিবী থেকে 22 লক্ষ আলোক বর্ষেরও বেশী। যদি মনে রাখো যে এক আলোক বর্ষ মানে প্রায় 10 লক্ষ কোটি (10-এর পর 12টা শূন্য) কিলোমিটার তাহলে এম-31-এর দূরত্বের একটা আন্দাজ পাবে। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা হলো এই যে তত দূরে থাকা সত্ত্বেও একে তোমরা শুধু চোখে দেখতে পাবে। অবশ্য মনে রেখ, আজ যে আলো তোমাদের চোখে পৌঁছচ্ছে এম-31 থেকে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল আজ থেকে 22 লক্ষ বছর আগে। মানে আজকে এম-31-এর যে রূপ আমাদের চোখে পড়ছে তা আসলে এর 22 লক্ষ বছর আগেকার রূপ। ঠিক এই মুহূর্তে এম-31কে দেখতে কেমন তা আমরা জানতে পাবো আজ থেকে 22 লক্ষ বছর পরে।

আকাশ পরিষ্কার থাকলে শুধু চোখে এম-31কে দেখায় খুব অস্পষ্ট লম্বাটে আলোর ছোপের মত। অবশ্য একে খুঁজে বের করতে একটু চেষ্টা করতে হবে। অ্যানড্রোমেডার খ-তারাটির একটু ওপরেই একে দেখতে পাবে, যেমন ছবিতে দেখানো হয়েছে। এম-31-এর আসল রূপ ধরা পড়ে শক্তিশালী দূরবীনে বহুক্ষণ ধরে তোলা ছবিতে। দেখা যায় একটি আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সির মতই পৃথক একটি গ্যালাক্সি। আমাদের ছায়াপথের মত এতেও

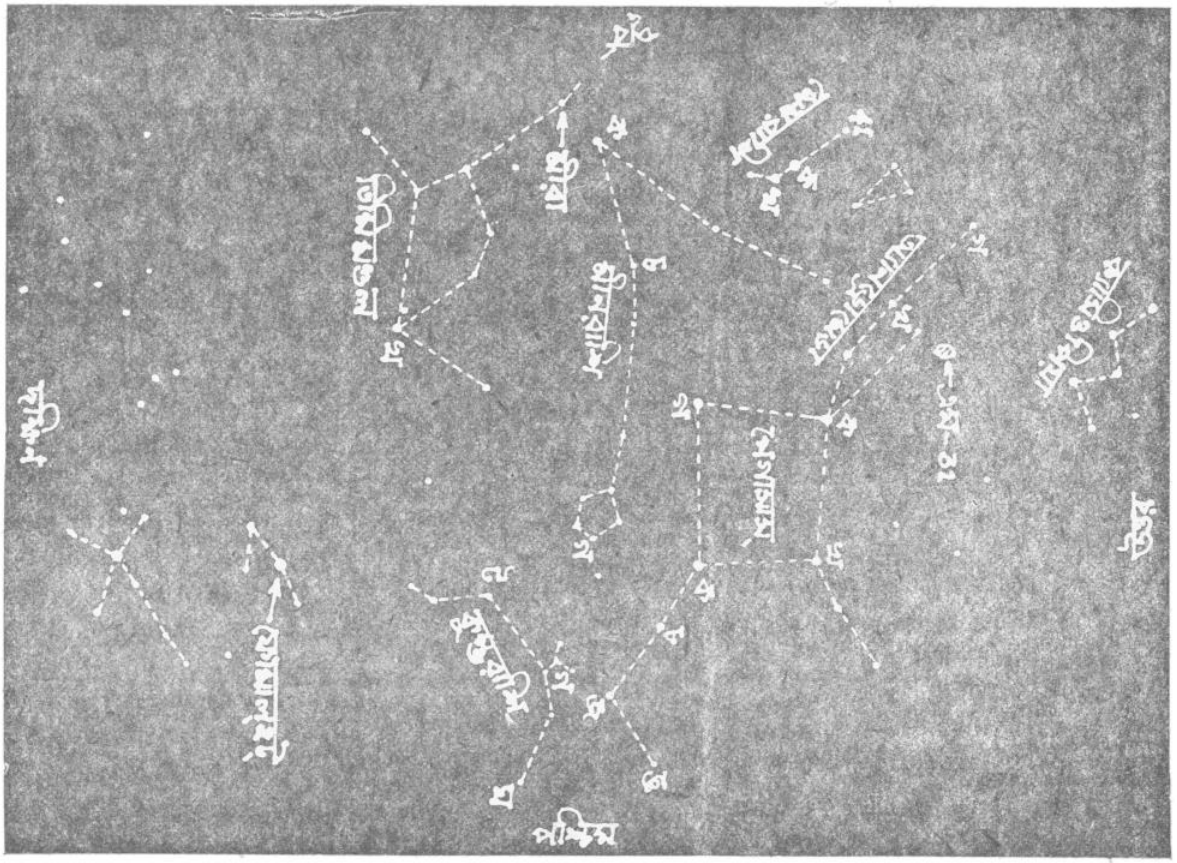

হেমন্তের আকাশ

রয়েছে কোটি কোটি তারার সমাবেশ। এম-31 মধ্যগমন করে 1লা অগ্রহায়ণ রাত 9টা এবং 1লা ভাদ্র ভোর 3টের সময়।

পেগাসাসের দক্ষিণ পশ্চিমে রয়েছে রাশিচক্রের একটি তারামণ্ডল কুম্ভ বা Aquarius। তারামণ্ডলটি বিস্তীর্ণ, কিন্তু এর তারাগুলির কোনওটিই খুব একটা উজ্জ্বল নয়। সেজন্য একে চিনতে একটু অসুবিধে হতে পারে। ক্রান্তিবৃত্তের ওপর কুম্ভ রাশি রয়েছে মকর রাশির উত্তর পূবে (ছবিতে দেখ)। এটিকে চেনবার সহজ উপায় হলো পেগাসাসের জ তারাটির ঠিক নিচে চারটি ছোট তারাকে প্রথমে খুঁজে বের করা। তারাগুলি খুবই ক্ষীণ, হয়তো চট্ করে চোখে নাও পড়তে পারে। কিন্তু একটু চেষ্টা করলেই চিনে নিতে পারবে। দেখবে চারটি তারা মিলে ইংরেজী অক্ষর 'y' তৈরী হয়েছে। ঐটেই হলো কুম্ভ রাশির 'কুম্ভ'। তারামণ্ডলটিতে আর কোনও বিশেষ দেখবার জিনিষ নেই। তবে এর ট-তারাটি হলো চান্দ্র নক্ষত্রের একটি, নাম শতভিষা। কুম্ভ রাশি মধ্যগমন করে 1লা কার্ত্তিক রাত 9টায় এবং 1লা শ্রাবণ ভোর 3টের সময়।

কুম্ভরাশির দক্ষিণে যে উজ্জ্বল তারাটিকে দেখা যায় তার নাম ফোমালহট্ (Fomalhaut)। যে তারা মণ্ডলে তারাটি রয়েছে তার নাম পিসিস্ অস্ট্রালিস্ (Piscis Australis) বা দক্ষিণ মৎস্য। তারামণ্ডলটি খুবই ছোট, ফোমালহট্ ছাড়া এতে আর কোনও উজ্জ্বল তারা নেই। ফোমালহট্ মধ্যগমন করে 1লা কার্ত্তিক রাত 9টায় এবং 1লা শ্রাবণ ভোর 3টের সময়।

রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশি মীন (Pisces) রয়েছে পেগাসাসের বর্গক্ষেত্রের দক্ষিণ পূর্ব কোণে, বিশাল এক 'v' এর আকারে। এ তারামণ্ডলটিতেও কোনও উজ্জ্বল তারা নেই বলে একে সহজে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। একটু চেষ্টা করলে পেগাসাসের বর্গক্ষেত্রের ঠিক দক্ষিণে

এম—৩১ গ্যালাক্সি

পাঁচটি তারার পঞ্চভূজ হয়ত চোখে পড়বে। ঐটেই হলো মীন রাশির দুটি মৎস্যের একটি। সম্পূর্ণ তারামণ্ডলটিকে দেখতে অনেকটা ইংরেজী অক্ষর 'v' এর মত। অবশ্য এর তারাগুলি এতই ক্ষীণ যে হয়ত চট্ করে চোখে পড়বে না। তবুও আকাশ পরিষ্কার থাকলে চেষ্টা করো, নিশ্চই খুঁজে পাবে। মীন রাশির চ-তারাটি হলো চান্দ্র নক্ষত্র রেবতী। তারাটির বৈশিষ্ট্য এই যে এটি রয়েছে ক্রান্তিবৃত্তের ঠিক ওপরে।

মীন রাশির মধ্যগমনের সময় 1লা অগ্রহায়ণ রাত 9টা এবং 1লা ভাদ্র ভোর 3টে।

রাশি চক্রের প্রথম রাশি মেষ (Aries) কে দেখতে পাবে মীন রাশির ঠিক পূবে। তারামণ্ডলটিতে দুটি উজ্জ্বল তারা আছে যাদের সহজেই চিনে নিতে পারবে। তারামণ্ডলটিতে দুটি চান্দ্র নক্ষত্র রয়েছে। খ-তারাটি অশ্বিনী এবং 41-সংখ্যক তারাটি ভরণী নক্ষত্র। মেষ-রাশি মধ্যগমন করে 1লা পৌষ রাত 9টা নাগাদ এবং 1লা আশ্বিন ভোর 3টের সময়।

অ্যানড্রোমেডা এবং মেষ রাশির ঠিক মাঝখানে একটি খুবই ছোট তারামণ্ডলকে দেখতে পাবে, নাম Triangulum বা ত্রিভুজ। ত্রিভুজের তারা তিনটি ক্ষীণ, কিন্তু আকাশ পরিষ্কার থাকলে এবং আকাশে চাঁদ না থাকলে সহজেই এটিকে খুঁজে নেওয়া যাবে।

মীন রাশির দক্ষিণে যে বিশাল তারামণ্ডলটিকে দেখা যায় তার নাম Cetus বা তিমিমণ্ডল। বলা হয় যে তারামণ্ডলটিতে 100টি তারা আছে সেগুলি শুধু চোখেই দেখা যায়। কিন্তু আসলে গোটা দশেকের বেশী তারা চোখে পড়ে না। তারামণ্ডলটিতে একটি তিমি মাছের আকৃতি কল্পনা করা হয়েছে। এতে তৃতীয় প্রভাব দুটি তারা আছে (ছবিতে ক ও খ) যাদের সহজেই চিনে নিতে পারবে। বাকি কয়েকটি তারাকেও এবারে চিনে নিতে অসুবিধে হবে না।

তিমিমণ্ডলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় তারাটি হলো লালচে হলদে রং এর তারা 'মীরা'। তারাটির ঔজ্জ্বল্য এক থাকে না, বাড়ে কমে। যখন সবচেয়ে উজ্জ্বল 'মীরা'র প্রভা হয়ে দাঁড়ায় ও। সে সময় শুধু চোখে তাকে দেখায় বেশ উজ্জ্বল। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই 'মীরা'র ঔজ্জ্বল্য কমে হয়ে দাঁড়ায় 10, তখন শুধু চোখে ত নয়ই, ছোট দূরবিনেও তাকে দেখা যায় না। দেখা গেছে যে তারাটির ঔজ্জ্বল্যের কম বেশী হতে সময় লাগে প্রায় 11 মাস (331 দিন), যার মধ্যে মাত্র 6 মাস তাকে শুধু চোখে দেখা যায়। সুতরাং প্রথমেই যদি মীরাকে খুঁজে না পাও হতাস হবার কিছু নেই। কয়েক মাস পরে হয়ত তাকে খুঁজে পেতে পারো। মীরা মধ্যগমন করে অগ্রহায়ণের শেষের দিকে রাত 9টা নাগাদ এবং আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহে ভোর 3টে নাগাদ।

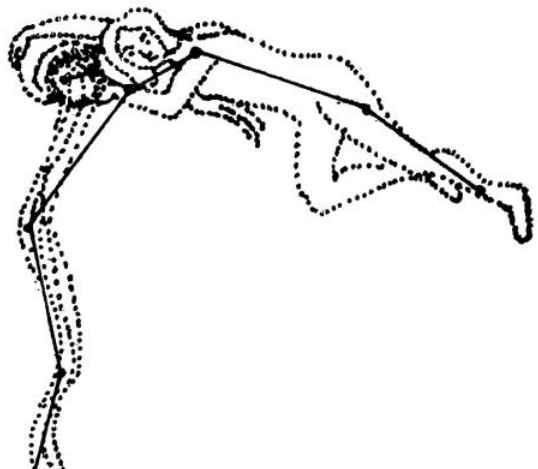

কুম্ভরাশি

যদি তোমরা পুরী বা তারও দক্ষিণে যাও তবে সেখান থেকে ফোমালহট্ তারাটির দক্ষিণে দুটি উজ্জ্বল তারা তোমাদের চোখে পড়বে দক্ষিণ দিগন্তের ঠিক ওপরেই। তারা দুটি Grus বা বকমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। এ দুটি তারাকে অবশ্য কলকাতা বা আরও উত্তর থেকে দেখতে পাবে না। (ক্রমশঃ)

7/UF কলেজ রোড, নয়া দিল্লী-1

কিছু মজার সাপ

বিকাশকান্তি সাহা

সাপ এমনিতেই দারুণ মজার প্রাণী। তাছাড়া আশ্চর্যজনক তো বটেই। এই মজার প্রাণীদের মধ্যে এমন কিছু কিছু সদস্যের সন্ধান মেলে যারা একটু বেশী মজাদার, আর বেশী আশ্চর্যজনক। এদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় উত্তর আমেরিকার র‍্যাটল স্নেকের (Rattle Snake)। বাংলায় যাকে 'ঝুমঝুমি' সাপ বলে। বিচিত্র অভিযোজনের ফলে এদের লেজের শেষ দিকটার অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তিত অংশকে বলে 'র‍্যাটল' (Rattle)। আসলে লেজের শেষের দিকের কশেরুকা (vertebra) গুলো পরিবর্তিত হয়েই এই র‍্যাটলে পরিণত হয়েছে। যখন এরা চলাফেরা করে বা খুব রেগে যায়, তখন এরা এদের এই র‍্যাটল নাড়াতে থাকে। আর র‍্যাটেলের পরিবর্তিত কশেরুকাগুলোর মধ্যে ঘষা লাগার ফলে ঝুমঝুম আওয়াজ হয়। এই থেকে এদের নাম ঝুমঝুমি সাপ। এরা খুবই বিষধর সাপ। তাই অনেকে এই আওয়াজকে 'সতর্কবাণী' বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, বড় বড় রাজপথ পার হওয়া নাকি এদের নেশা।

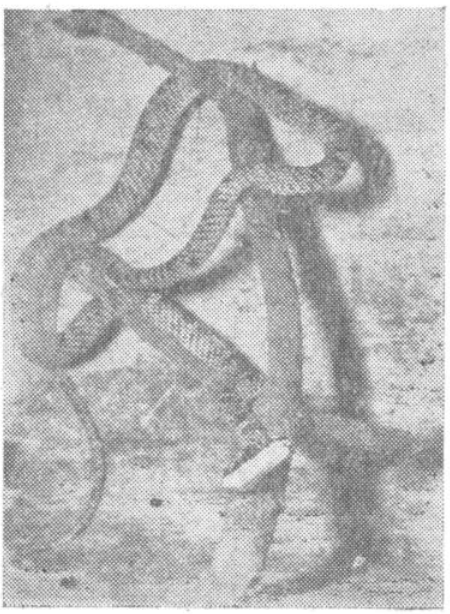

কালনাগিনী-বাংলায় যাকে উড়ন্ত সাপ বলে।
আলোক-চিত্র : বিকাশকান্তি সাহা

শংখচূড় আলোকচিত্র : রণজিৎ মণ্ডল

রিঙ্গ্যালস্ কোবরা (Ringhals Cobra) দক্ষিণ আফ্রিকার নামকরা সাপ। এদের 'স্পিটিং কোবরা' ও (spitting Cobra) বলা হয়ে থাকে। খুবই বিষধর সাপ। এরা শত্রুর মুখোমুখি হলে শত্রুর চোখ লক্ষ্য করে বিষ ছোঁড়ে। পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেছে যে, 6 ফুট লম্বা রিঙ্গ্যালস্ কোবরা প্রায় 12 ফুট পর্যন্ত বিষ ছেটাতে পারে। তাছাড়া, কোবরা (Cobra) গোষ্ঠীর সব সাপই ডিম পেড়ে থাকে—কিন্তু রিঙ্গ্যালস্ কোবরা সরাসরি বাচ্চা প্রসব করে।

আফ্রিকার সমভূমিতে বিচরণকারী বিরাট আকৃতির বিষধর সাপ ব্ল্যাক মাম্বা (Black Mamba)। সাপেরা এমনিতে খুব জোরে দৌড়তে পারে না। বিজ্ঞানী মেইনার্থাজেন (Meinerthagen) পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, ব্ল্যাক মাম্বা প্রতি ঘণ্টায় 9 মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে।

আফ্রিকার আর এক মজার সাপ পাফ্-অ্যাডার (Puff-Adder)। এই পাফ্-অ্যাডার প্রায়ই মৃতের ভান করে পড়ে থাকে এবং অসতর্ক মুহূর্তে শত্রুকে অতর্কিত মরণ ছোবল মারে।

শংখচূড় (King Cobra) সাপের নাম প্রায় সবারই শোনা। এই সাপ আমাদের ভারতেও প্রচুর পরিমাণে আছে। তবে এরা সাধারণতঃ পাহাড়ী অঞ্চলেই বাস করে। অবশ্য, সুন্দরবনেও শংখ চূড়ের নজির মেলে। একমাত্র কোবরা গোষ্ঠীর সাপেরাই ফণা তুলতে পারে। তবে কোবরা গোষ্ঠীর সদস্য এই শংখ চূড়ের ফণা সত্যিই তুলনাহীন। অনেক সর্প বিশারদই শংখচূড়কে এক নাগাড়ে ২/৩ দিন ফণা তুলে থাকতে দেখছেন।

'উড়ন্ত সাপে'রও (Flying Snake) নজির মেলে—

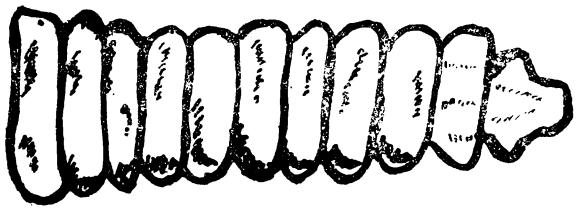

র‍্যাটলস্নেকের 'র‍্যাটল' বা 'ঝমঝমি'

তা আবার একমাত্র আমাদের ভারতবর্ষেই। উল্লেখ্য যে, 'উড়া' (Fly) এই কথাটা নিঃখুত বৈজ্ঞানিক কোন থেকে বিচার করলে কিন্তু অন্যরকম দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে 'উড়া'র চেয়ে 'ভেসে বেড়ান' (Glide) কথাটাই প্রকৃত পক্ষে যুক্তিযুক্ত। যাকে আমরা 'কালনাগিনী' (Golden tree Snake) বলে চিনি। মনসামঙ্গল কাব্যে আছে এই কালনাগিনীর কামড়েই নাকি চাঁদ সদাগরের ছেলে লখীন্দর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এ নিছক পৌরাণিক গল্প ছাড়া কিছুই নয়। কালনাগিনী একেবারে নির্বিষ গোবেচারা সাপ। বিদেশে অনেক যুবক যুবতীই এই কালনাগিনী পোষে—এর অপরূপ দেহ সৌন্দর্যের জন্য। রম্যুলাস হুইটেকার (Romuluc whitaker) তাঁর বইয়েতে (Common Indian Snakes A field Guide, 1978) লিখেছেন যে, আন্দামানের নারকোন্দামে 'উড়ন্ত সাপের আর এক প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'প্যারাডাইস ফ্লাইং স্নেক' (Paradise Flying Snake)॥

সংগ্রহ সূত্র

1. Common Indian Snakes—A field Guide —1978. By Romulus Whitaker.
2. The Snakes of India—1935 By K. G. Ghaspurey.
3. আজকের জার্মানী—সংখ্যা ঃ তিন ঃ মে ঃ 1972
4. কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান—জুন ঃ 1982
5. Text Book of Zoology, vol-II Vertebrates—1974. By Parker & Haswell

রায়দীঘি বুর‍্যাল হাসপাতাল, রায়দীঘি।

শল্য চিকিৎসায় ক্লোরোফর্ম

প্রদীপকুমার দাস

ট্রলিটি চলেছে ধীরে ধীরে। ঠেলছেন একজন সিস্টার, গন্তব্যস্থল অপারেশন থিয়েটার। পাশে পাশে স্যালাইনের বোতল হাতে সঙ্গে চলেছেন আর একজন সিস্টার। ট্রলিতে শায়িতা একজন ভদ্র মহিলা। অপারেশনের সময় আসন্ন। সেই ভয়ে বিবর্না। পাশের সিস্টারটি তাঁকে স্বান্ত্বনা দিচ্ছেন ভয় কি! আপনাকে ক্লোরোফর্ম করা হবে, আপনি কিছুই টের পাবেন না। কিছুটা আশ্বস্ত হন ভদ্র মহিলাটি। আমরা হয়তো অনেকেই ক্লোরোফর্মের গুণাগুণ সম্বন্ধে অবহিত। এটা একটা চেতনানাশক দ্রব্য। শল্য-চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। আজ কাল অবশ্য আরও ভাল চেতনা নাশক দ্রব্য হাতে আসায়, চিকিৎসকেরা খুব কমই এটা ব্যবহার করেন। তবে কিছু দিন আগে পর্যন্ত এর ব্যবহার ছিল সর্বাধিক। এই ক্লোরোফর্মের নামের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা নাম মনে পড়ে। সেই নামটি হল ডক্টর সিমসন। স্কটল্যাণ্ডের একজন নামকরা ডাক্তার। 1827 সালে সিমসন এডিনবার্গ বিশ্ব বিদ্যালয়ে ডাক্তারী পড়ার জন্যে ভর্ত্তি হন। ডাক্তারী শাস্ত্রে স্নাতক হন 1812 সালে। স্ত্রীরোগ বিশারদ হিসেবে অল্প দিনের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেন। ডাক্তার সিমসন তাঁর ডাক্তারী পেশার সঙ্গে সঙ্গে ভাবতেন শল্য-চিকিৎসার সময় মানুষের অবর্ণনীয় কষ্টের কথা। সেই সময় ছিল না হাতে কোন চেতনা-নাশক দ্রব্য। অস্ত্রোপচার করা হত সজ্ঞানেই। রুগীকে চেপে ধরে রাখতো বেশ কয়েক-জন ষণ্ডামার্কা লোক। তার কানের কাছে বাজানো হত ঢাক-ঢোল-ঘন্টা কাঁসর ইত্যাদি। রুগীর করুণ আর্তস্বর ওই ঘন্টা কাঁসরের শব্দ ভেদ করে খুব বেশি দূর যেতে পারতো না।

এই ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হল চীন দেশে। ঐ দেশের শল্য-চিকিৎসকেরা ব্যবহার শুরু করলেন এক রকম গাছের রস। ঐ রসকে রুগীর নাকে শুঁকিয়ে দিতেন শল্য-চিকিৎসকেরা। রুগী বেশ কিছুক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকত। তৎকালীন সময়ে আমাদের দেশেও বিভিন্ন ভেষজ দ্রব্যকে চেতনানশক হিসেবে কাজে লাগানো হত। ফলে কষ্ট তেমন থাকতো না অস্ত্রোপচারের সময়। অসুবিধে দেখা দিত রুগীর জ্ঞান ফিরিয়ে আনার সময়। প্রাণ হারাতে হত অনেক রুগীকে। এল 1799 সাল। আবিষ্কার হল নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস। বাংলায় লাফিং গ্যাস নামে পরিচিত। আবিষ্কারক স্যার হামফ্রে ডেভী। অচিরেই লাফিং গ্যাসের ব্যবহার শুরু হল চিকিৎসা বিজ্ঞানে চেতনা নাশ করার জন্যে। খুব একটা আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া গেল না। উপকারের পরিবর্তে অপকারের দিকটাই হয়ে উঠল ভারী। অনুসন্ধান চলতে লাগল আরও ভাল চেতনা নাশক দ্রব্যের জন্যে। 1846 সালে আমেরিকার ডাক্তার মর্টন আবিষ্কার করলেন 'সালফিউরাস ইথার।' আমেরিকায় সালফিউরাস ইথারের ব্যবহার শুরু হল দাঁত ও অন্যান্য দেহের অস্ত্রোপচারে।

1847 সালে ডাক্তার সিমসন শুরু করলেন সালফিউ রাস ইথারের ব্যবহার মায়ের দেহে সন্তান প্রসবের সময়। অসহ্য যন্ত্রণা থেকে তিনি মায়েদের কিছুটা স্বস্তি দিলেন। সালফিউরাস ইথারের কাজ কর্ম সম্বন্ধে তিনি মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। সালফিউরাস ইথারের অপ্রীতিকর ও ঝাঁঝালো গন্ধের জন্যে রুগীরা শুঁকতে চাইতো না। ফল ভাল পাওয়া গেলেও শল্য-চিকিৎসকদের মনে সন্দেহ দেখা দিতে লাগল এর উপযোগীতা সম্বন্ধে। ডাক্তার সিমসন চেষ্টা চালাতে লাগলেন আরও ভাল চেতনানাশক দ্রব্যের জন্যে। ইতিমধ্যে রসায়ন শাস্ত্রে ক্লোরো-ফর্ম নামক রাসায়নিক পদার্থের আবিষ্কার হয়ে গেছে। ডেভিড ওয়াল্ডি নামে লিভারপুলের একজন ডাক্তার ও রসায়নবিদ সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন ক্লোরোফর্মের চেতনা-নাশক গুণের কথা। তিনি সরাসরি পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোন সুযোগ পাননি। 1847 সালে ডাক্তার সিমসন বিভিন্ন চেতনা নাশক পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মনস্থ করেন। অক্টোবর মাসের এক সন্ধ্যায় তিনি বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানান। ঘরোয়া পরিবেশে শুরু হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ। একে একে প্রত্যেকে শুঁকতে লাগলেন বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে। উল্লেখযোগ্য সেদিন কিছুই হল না। বন্ধুরা একে একে বিদায় নিলেন। নভেম্বর মাসের এক সন্ধ্যায় ডাক্তার সিমসন আবার আমন্ত্রণ জানালেন দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে। জর্জ কিথ্ ও সেথিড ডানকান। উদ্দেশ্য একটাই। নিজেদের উপর বিভিন্ন চেতনা নাশক পদার্থের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, কিছু দিন আগে ডাক্তার সিমসন এক বন্ধুর মারফৎ ক্লোরোফর্মের একটি প্যাকেট পেয়েছিলেন।

ওই প্যাকেটটির প্রতি তিনি খুব একটা দৃষ্টি দেন নি। বাড়ীতে এনে একটা অব্যবহার্য্য ঝুড়িতে ফেলে রেখে-ছিলেন। ঐদিন সন্ধ্যায় পুনরায় শুরু হল দুই বন্ধুসহ ডাক্তার সিমসনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ। বলা বাহুল্য আশানুরূপ ফল তাঁরা পেলেন না। খুব হতাশ হয়ে ডাক্তার সিমসন ক্লোরোফর্মের প্যাকেটটিকে অব্যবহার্য্য ঝুড়ি থেকে তুলে এনে শুঁকতে লাগলেন। পরে দিয়ে দিলেন দুই বন্ধুর হাতে। দুই বন্ধুও হাতে নিয়ে শুঁকলেন। শুরু হল নাক জ্বালা, চোখ লাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক্তার সিমসনসহ দুই বন্ধু সটান ঢলে পড়লেন চেয়ারে। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার সিমসনের জ্ঞান ফিরে এল। প্রথমটা বুঝতে পারলেন না কিছুই। শুধু দেখলেন পাশের দুই বন্ধুকে তখনো পর্যন্ত চেয়ারে ঘুমানো অবস্থায়। আস্তে আস্তে সব বুঝতে পারলেন। এতই উৎসাহিত হয়ে পড়লেন যে ঐদিনই বেশ কয়েকবার নিজের দেহে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করে শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে বন্ধ করলেন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ। সম্পূর্ণরূপে অবহিত হলেন ক্লোরোফর্মের চেতনানাশক গুণের সম্বন্ধে।

অল্পদিনের মধ্যেই তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে শুরু করলেন ক্লোরোফর্মের ব্যবহার। মায়ের দেহে সন্তান প্রসবের বেদনা লাঘব করার জন্যে তিনি এক সপ্তাহের মধ্যে পঞ্চাশজনের উপর ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করে খুব ভাল ফল পেলেন তাঁর ঐরূপ সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে শল্য-চিকিৎসকেরা 1847 সালে 15ই নভেম্বর প্রথম ক্লোরো-ফর্মের সাহায্যে চেতনা নাশ করে অস্ত্রোপচার করেন। অস্ত্রোপচারটি নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়। এরপরে এডিনবার্গের রয়েল ইনফর্মারিতে আরও তিনটি অস্ত্রোপচার করা হয় ক্লোরোফর্মের সাহায্যে। ডাক্তার সিমসনের এই কৃতকার্যতা তৎকালীন ধর্ম যাজকেরা ভাল মনে মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরা বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে সিমসনের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে লাগলেন, ডাক্তার সিমসন খুবই গর্হিত কাজ করেছেন সন্তান সম্ভাব্য মায়েদের দেহে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করে। শিশুর জন্ম হয় মায়ের দেহে ব্যথা দিয়ে। ভগবানের এটাই ইচ্ছে। ডাক্তার সিমসন মায়ের দেহে ক্লোরোফর্মের সাহায্যে ব্যথা কমিয়ে ভগবান বিরুদ্ধ কাজ করেছেন। ডাক্তার সিমসন বাইবেলের উদ্ধৃতি তুলে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন তিনি কোন গর্হিত কাজ করেন নি। পৃথিবীর প্রথম মানব জন্মের সময় স্বয়ং ভগবানই চেতনা নাশক পদার্থ ব্যবহার করে ছিলেন। সেজন্যে সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। তাঁর অকাঠ্য যুক্তিতে ধর্মযাজকেরা আর কিছু উচ্চ-বাচ্য করলেন না। শান্ত মনে মেনে নিলেন। ডাক্তার সিমসন 1853 সালে ডিক্টোরিয়ার সপ্তম সন্তান প্রসবের সময় ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করেন। রাণীর সপ্তম সন্তান লিওপোল্ড নির্বিঘ্নেই ভূমিষ্ঠ হয়। 1857 সালে রাণীর অষ্টম সন্তান বেয়াট্রিসের জন্মের সময়ও তিনি ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করেন। সমাজের উচ্চ-স্তরের মানুষের কাছে ক্লোরোফর্মের এইরূপ সমাদর দেখে ডাক্তার সিমসনের বিরোধীপক্ষের রসনা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। অল্পদিনের মধ্যে ক্লোরোফর্মের ব্যবহার শুরু হল ইংল্যাণ্ডে। উত্তর অমেরিকা ও পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়। এইভাবে চিকিৎসা জগতে স্থান করে নিল ক্লোরোফর্ম অন্যতম চেতনা নাশক দ্রব্য হিসাবে। সেই সঙ্গে অমর হয়ে রইলেন ডাক্তার জেমস সিমসন।

২/সি, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা-৯

পৃথিবীর বৃহত্তম হীরক

নির্মল কুমার ঘোষ

1905 খ্রীষ্টাব্দের 20শে জানুয়ারী দক্ষিণ আফ্রিকার রিপাবলিক ট্রান্সভ্যালের প্রিমিয়ার খনিতে মহামূল্যবান বিরাট এক হীরক খণ্ড পাওয়া যায়। অবশ্য একে হীরের খণ্ড না বলে 'তাল' বলাই ভাল।

খনি মালিক প্রেসিডেন্ট টমাস কুলিনান [T. Culli-nan] তাঁরই নামানুসারে হীরক খণ্ডটির নাম রাখা হয় "কুলিনান হীরক।" হীরক খণ্ডটির ওজন ছিল $1\frac{1}{2}$ পাউণ্ড অর্থাৎ 3, 106 ক্যারাট বা 600 গ্রামেরও বেশী। ট্রান্সভ্যাল সরকার সেটি 1,50,000 পাউণ্ড দিয়ে কিনে নেন।

1907 খ্রীষ্টাব্দে সেই হীরক খণ্ডটি ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডকে তাঁর জন্ম দিনে উপহার দেওয়া হয়। আর্মস্টারডামের অ্যাসার কোম্পানীর হীরক কাটা সুদক্ষ ক্যারিগর সেটিকে চারটি বড়, সাতটি মাঝারী এবং কয়েকটি ছোট ছোট টুকরোয় কেটে ফেলেন। বড় টুকরোর মধ্যে ডিমের আকারের একটি সবচেয়ে বড় হীরের টুকরোর ওজন হল 530.2 ক্যারাট। এরই নাম 'স্টার অব আফরিকা ডায়মণ্ড।' ইংরেজ রাজার রাজ দণ্ডের মাথায় সেটিকে সযত্নে বসিয়ে দেওয়া হয়। এক খণ্ড রাজ মুকুটের মধ্য মণিও করা হয়। বাকি তিনটির ওজন হল 317.4, 94.45, ও 63.65 ক্যারাট।

মূল কুলিনান হীরকের চাইতে বড় হীরক আজ পর্যন্ত আর কোথাও পাওয়া যায় নি। সুতরাং কুলিনান হীরকই পৃথিবীর বৃহত্তম হীরক বলা যায়।

সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

কালাহারির প্রান্তরে

শ্যামলী বসু

[আফ্রিকার আদিম অধিবাসী বুশম্যান। এখানকার নিগ্রয়েড লোকেদের অনেক আগে থেকেই এই বুশম্যানরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত আফ্রিকার অনেকখানি জুড়ে। পরে বান্টু, জুলু, এইসব যুদ্ধপ্রিয় গোষ্ঠীদের উৎপাতে এরা প্রধানতঃ দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহারি মরুভূমি আর তার আশপাশের জায়গায় সরে এসেছে। বুশম্যানেরা ছোটখাটো মানুষ, প্রায় সাড়ে চার ফুট বা তারও সামান্য লম্বা হয়। এদের গায়ের বাদামী রং রোদে পুড়ে কালচে বাদামী হয়ে যায়, চুলগুলো কোকড়ানো আর ঘন। এদের বিচিত্র জীবনযাত্রার কিছু কিছু গল্পের ঢঙে এখানে বলা হয়েছে।]

খোঁড়া টোমা তার দল বল নিয়ে এগিয়ে চললো নতুন জায়গার খোঁজে। পুরোনো ঘাসবনে থেকে আর লাভ নেই। শিকারও কমে এসেছে। তা ছাড়া কন্দ, ফল কাছাকাছি যা ছিল, সবই মেয়েরা তুলে এনে খেয়ে শেষ।

তাই কালাহারির ঘাসবন, কাঁটাঝোপের মধ্য দিয়ে আবার যাত্রা শুরু হলো। ছেলেদের হাতে তীরধনুক, মেয়েদের পিঠে চামড়ার ঝুলিতে ঘরকন্নার জিনিসপত্র, কারো কোলে ছোট্ট ছেলেটি।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা চললো বড়দের সঙ্গে সঙ্গে। তাদের কোমরে এক টুকরো চামড়ার ফালি, মেয়েদের চুলে সাজানো আছে অস্ট্রিচ পাখির ডিমের খোলা থেকে তৈরী মালা, গলায় ঝুলছে চামড়ার দড়িতে গাঁথা হাড় বা কাঠের টুকরোর মালা।

সবার আগে চলছিল বুড়ো কিউই, দলের নেতা খোঁড়া টোমার সঙ্গে। সে ইসারা করে দেখালো শুকনো ঘাসবনের মধ্যে উপ্টোনো থালার মতো গর্ত—জল? এক সময় হয়তো জল ছিল, এখন সেটা কাদাভরা গর্ত, চারদিকে নলখাগড়ার বন। ঐ গর্ত খুঁড়লেই কিছুটা জল পাওয়া যাবে। আর জল যদি নাই পাওয়া যায়, কি করা যাবে? ডিসেম্বর থেকে মার্চ অবধি কালাহারির প্রান্তরে কোথাও কোথাও জল মেলে। তারপর তো তরমুজ বা রসালো ফল-মূলই ভরসা।

জায়গাটা সকলের পছন্দ হলো। এখানে বেশ কিছু দিন থাকতে হবে। মেয়েরা চটপট লম্বা ঘাস তুলে ঘন করে গোছা বেঁধে ফেলে, দুটি ঘন ঘাসের গোছার মাঝখানটা জন্তুর শুকনো নাড়িভুঁড়ির দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধলো। এবার গাছের ডাল ভেঙ্গে খাড়া করে আটকে তার ওপর দিয়ে ঘাসের গোছা দুদিকে ঝুলিয়ে দিতেই চমৎকার উপুড় করা বাটির মত ঘর তৈরি হয়ে গেল। সামনের দিকে রইলো সামান্য ফাঁক, সেটাই ঘরের দরজা।

ঘর তো হলো। এবার আগুন জ্বালার ব্যবস্থা করতে হয়। কাঠকুটো মেয়েরা জোগাড় করবে, কিন্তু আগুন জ্বালার কাজটা করবে পুরুষেরা, এটাই নিয়ম। কাঠকুটো ভরা একটা ছোট গর্তের ভিতর মোটা একটুকরো কাঠ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘষে ঘষে আগুন জ্বালাতে হয়। দুই বুড়ো লেগে গেল সেই কাজে। শিগ্‌গিরই আগুন জ্বলে উঠলো। তখন প্রত্যেকে এক এক টুকরো জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে নিজের ঘরের সামনে আগুন জ্বালিয়ে নিলো। নতুন কোন দল উপস্থিত হলে ভাবনা নেই, কারো ঘর থেকে আগুন ধরিয়ে নিলেই চলবে।

এরা অবশ্য ঘরের মধ্যে থাকতে ভালোবাসে না। ঘরের সামনে বসে সময় কাটায়, কাজকর্ম করে। ছেলেমেয়েরা খেলা করে, বড়রা সন্ধ্যাবেলা আগুনের সামনে গোল হয়ে বসে বলে নানা শিকারের কথা। বুড়োরা ছোটদের গল্প শোনায়।

গল্প হতে হতে কোন মায়ের রান্না সারা হয়ে যায়। রান্না বলতে একটা বড় লোহার পাত্রে অস্ট্রিচ পাখির ডিমের মণ্ড করা হয়েছে। লোহার পাত্রটা মা কিনেছে বান্টুদের কাছ থেকে, কোন জন্তুর একখানা আস্ত চামড়ার

বিনিময়ে। দরকারী জিনিস এমন করেই ওরা জোগাড় করে। অস্ট্রিচ পাখির ডিমের বড় বড় খোলাগুলো মেয়েরা ফেলে না, জল ভরে রাখে, কিম্বা রান্না রেখে দেয়। কচ্ছপের শক্ত খোলাও রান্না ঢেলে রাখার কাজে লেগে যায়।

খুব ভোরে, সূর্য ওঠার আগে দলের ছেলেরা বেরিয়ে পড়ে শিকারের সন্ধানে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে শিকার করে তারা। দূরে জানোয়ারের দেখা পেলে শিকারীরা গুঁড়ি মেরে বসে পড়ে। তারা জানে যে খোলা মাঠে গুঁড়ি মেরে-বসা লোকটিকে দেখে জানোয়ারেরা তাকেও কোন জানোয়ারই ভাববে। তাই নির্ভয়ে চরতে চরতে চলে আসে কোন শিকারীর নাগালের মধ্যে। তারপর অব্যর্থ লক্ষ্যে ছোঁড়া তীর ঠিক গিয়ে বিঁধে যায় শিকারের গায়ে। নল-খাগড়ার তৈরী প্রায় দু ফুট লম্বা তীর, তীরের ফলাটা বুড়ো আঙুলের নখের থেকে সামান্য বড়, কিন্তু বড় মারাত্মক এই তীর। এক জাতের শুঁয়োপোকা নিঙড়ে তার বিষাক্ত রস মাখানো হয় তীরের ফলার পিছন দিকে। তারপর আগুনে শুকোনো হয় ঐ তীরের ফলা। শিকারীরা তীরের ঠিক মুখেই ঐ বিষাক্ত রস মাখায় না। কারণ সাবধানের মার নেই। যদি দৈবাৎ নিজেদের গায়েই কখনো তীরের ফলার আঁচড় লাগে। এই বিষের কয়েক ফোটা একটি বড় জন্তুকে কিছুক্ষণের মধ্যে একেবারে শেষ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

লম্বা গাও সারা রাত ঘুমোতে পারে নি। সে গতকাল সন্ধ্যার মুখে একটা বড় 'কুডু' হরিণ মেরেছিল, অন্ধকারে হরিণের পিছনে ধাওয়া করা সম্ভব হয় নি। তাই পরদিন খুব ভোরেই জনাদশেকের একটা দল জুটিয়ে ছুট্‌লো হরিণের পায়ের ছাপ লক্ষ্য করে। খোলা আকাশ, রুক্ষ মরুভূমির মধ্যে থেকে থেকে এদের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে আর নির্ভুল এদের দিকের জ্ঞান। মাইলের পর মাইল তাড়া করে ছুটে চলে আহত জন্তুকে, আবার ঠিক ফিরে আসে নিজেদের ডেরায়।

অনেক-অনেকখানি ছুটে ওরা হরিণটাকে দেখতে পেল, একটা ঝোপের ধারে খোলা জমিতে পড়ে আছে। কিন্তু কি সর্বনাশ! হরিণ ঘিরে বসে আছে গোটা পাঁচেক সিংহের একটি দল। বেশ খানিকটা মাংস

হরিণ ঘিরে বসে আছে সিংহের দল

খাবলে খুবলে খেয়েও নিয়েছে তারা। তবে শিকারের ওপর শিকারীদের দাবিই বেশি। তাই শিকারীরা চেঁচামেচি শুরু করে মাটির ঢেলা আর পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে দল বেঁধে এগিয়ে চললো। ওদের এগোতে দেখে সিংহগুলো চাপা রাগে গরগর করে উঠে দাঁড়িয়ে, মুখ ভেংচে লেজ ঝাপ্‌টে দূরের ঝোপে পালিয়ে গেল।

গাওদের আনন্দ তখন দেখে কে! হরিণ ঘাড়ে তারা ছুট্‌লো ওদের ঘরের দিকে। এই হরিণের কিছু কি ফেলা যাবে? মাংসটা খাওয়া হবে, চামড়া শুকিয়ে গায়ের কাপড় হবে, হাড়গোড় গুড়িয়ে, মজ্জা চুষে খাওয়া হবে, আর নাড়ি ভুঁড়ি শুকিয়ে তৈরি হবে ধনুকের ছিলা, কাঠ বা ঘাস বাঁধবার দড়ি।

শিকার নিয়ে ফিরে আসতে আসতে শিকারীরা গল্প জুড়লো—লম্বা গাওয়ের ভাগ্য ভাল। এই তো কদিন আগে কিউইর শিকার করা জেব্রার খোঁজ করতে গিয়ে কি পাওয়া গেল? কথানা হাড় আর চামড়ার টুকরো! রাতের অন্ধকারে সিংহের দল সবটাই চেটে পুটে শেষ করে রেখে গেছে।

এদিকে মেয়েরাও কিন্তু বসে নেই। খুনা, ডিকাই, নাই, খুশে—এরা সবাই মাটি খোঁড়ার কাঠি হাতে নিয়ে সকালেই বেরিয়ে যায়। খুঁজে বার করে বুনো ফল, খুঁড়ে আনে কন্দ বা মূল কিম্বা অস্ট্রিচের ডিম। এছাড়া আগুন জ্বালাবার কাঠকুটোও জোগাড় করে তারা।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সারাদিনই খেলায় মেতে থাকে। মেয়েরা কাঠি, ঘাস আর পাতা দিয়ে তৈরি করে ছোট্ট-ছোট্ট ঘর, কখনো বা গাঁথে ডিমের টুকরোর মালা। ইচ্ছে হলে তরমুজের খোল নিয়ে লোফালুফি করে। লক্ষ্মী মেয়েরা মায়ের সঙ্গে মাটি খোঁড়ার কাঠি নিয়ে ফল-মূল খুঁজে আনতে যায়।

রাতের বেলায় দরকার পড়লে ভূত তাড়ানোর নাচ নাচে বড় ছেলেরা। খোঁড়া কিউইকে বিষাক্ত সাপে ছোবল মেরেছে। পা ফুলে ঢোল, যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে বেচারা। একটা আগুন জ্বালানো হলো। আগুন ঘিরে গোল হয়ে হাত তালি দিয়ে মেয়েরা গান ধরলো বিচিত্র সুরে, গানের কোন কথা নেই। তাদের পিছনে গোল হয়ে নাচতে নাচতে ছেলেরা দুষ্টু আত্মাদের ডেকে বকতে লাগল—'কেন, তারা কুঁড়ে কিউইর এমন ক্ষতি করেছে, কেন, কেন?' পর পর কয়েক রাত ধরে নাচ চললেও কিউইর কোন উন্নতি হলো না, পা পচে গেল! কাছাকাছি ঘাসবনে একদল সাদা মানুষ তাঁবু ফেলেছিল এদের জীবনযাত্রা, রীতিনীতি সব জানবার জন্যে। তারা খবর পেয়ে তাদের ট্রাকে করে কুঁড়ে কিউইকে শহরের হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল। পা অপারেশান করে—দিব্যি একখানা কাঠের পা লাগিয়ে ফিরে এলো কুঁড়ে কিউই। আর তাকে দেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো দলের নেতা খোঁড়া টোমা—আহা, তার পায়ের ঘা যখন বিষিয়ে গেল তখন যদি কাছাকাছি এমন সাদা মানুষ থাকত!

এক জায়গায় বাসা তুলে অন্য আর এক জায়গায় যাবার সময় তার পায়ে কি যে হয়েছিল, কি যন্ত্রণা! ছেলেমেয়েদের পায়ে এমন কিছু হলে যন্ত্রণার জায়গাটা ধরে রক্ত চুষে বার করে দেয়, তাতেই অনেক সময় ব্যথা সেরে যায়। কিন্তু টোমার বাবা-মা থামলোওনা, শুনলোওনা। তখন পা বিষিয়ে গিয়ে চিরদিনের মত খোঁড়া হয়ে গেল সে। এদিকে দলের নেতার ছেলেই আবার নেতা হবে। শিকার করতে বেরিয়ে সিংহের মুখে মারা পড়ল টোমার বাবা, যখন দলের সকলেই খুব চিন্তায় পড়ল। যতদিন না টোমা একটা বড় জন্তু শিকার করতে পারে ততদিন তাকে তো সম্পূর্ণ মানুষ বলে ধরা যাবে না। তা ছাড়া সম্পূর্ণ মানুষ না হলে দলের নেতা হওয়াও অসম্ভব, এমন কি তার বিয়েও হবে না। খোঁড়া টোমা কি পারবে বড় জন্তু শিকার করতে? অবশ্য টোমা এমনিতে যথেষ্ট সাহসী, জেদী আর বুদ্ধিমান, ছোটখাটো শিকার ও সে করেছে। একদিন সুযোগ পেয়েই টোমা একটা বড় 'কুডু' হরিণকে তীরে গেঁথে ফেললো। দলের লোকেরা খুব খুশি হয়ে অনেকখানি দৌড়ে সেটাকে খুঁজে আনলো।

তারপর বিকেলবেলায় রান্না হলো সেই হরিণের মাংস। দলের এক বুড়ো টোমার সারা গা চিরে চিরে ঐ মাংসের ঝোল ছুঁইয়ে দিল। চোখের তলায় দেওয়া হলো ভাল দৃষ্টির জন্যে, বুকে সাহসের জন্যে, মজবুত পায়ের জন্যে দেওয়া হলো পায়ে, আর অব্যর্থ লক্ষ্যের জন্যে হাতে। ব্যস! আর কোন চিন্তা রইলো না। সম্পূর্ণ এক মানুষ হয়ে টোমা হয়ে গেল দলের নেতা। আলাদা এক ঘাসের বোঝার ঘর তুলে, দলের একটি মেয়েকে তার 'বউ' খুঁজে দেওয়া হলো।

হাজার বছর আয়ু

শঙ্কর পাল

অজানাকে জানার ও অচেনাকে চেনার জন্য মানুষ দিনে দিনে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রথম যেদিন মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখল সেদিন তারা জানত না-এর পিছনে কারণ কি? কিন্তু পরবর্তীকালে এর কারণ উদঘাটিত হয়। এখন আমরা প্রায় সবাই জানি যে, ঘর্ষণের ফলে তাপ শক্তির উদ্ভব ঘটে। তাই আদিম কালের মানুষ পাথরে পাথরে ঘষে আগুন জ্বালত। কিন্তু আজ বিজ্ঞানের যুগ, দৈনন্দিন জীবনে আমরা যা কিছু করি বা যা কিছু দেখি তা প্রায় সবই বিজ্ঞানের দান। তোমরা শুনে আশ্চর্য হবে যে, এই বিজ্ঞান মানুষকে হাজার হাজার বছর বাঁচতে সাহায্য করতে পারে। ব্যাপারটা একটু খুলেই আলোচনা করা যাক।

আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের (Special theory of rebtivity) সাহায্যে আমরা বলতে পারি যে কোন বস্তুর স্থির অবস্থায় যে ভর থাকে গতিশীল অবস্থায় সে ভর থাকে না! বেগ যত বাড়ে ভরও ততো বাড়তে থাকে। এখন ধরি,—

m_v = গতিশীল অবস্থায় বস্তুর ভর

m_r = স্থির অবস্থায় বস্তুর ভর

v = বস্তুর গতিবেগ

ও c = আলোর (Light) গতিবেগ

তাহলে সূত্রানুসারে আমরা পাই,

$$m_v = \frac{m_r}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

যদি বস্তুর গতিবেগ আলোর গতিবেগের সমান হয় তবে বস্তুর ভর অসীমে পৌঁছায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আলোর গতিবেগের থেকে বেশী গতিবেগ সম্পন্ন কোন্ বস্তুকণা আছে কি? বিজ্ঞানীরা এই রকম একটি কণার নাম দিয়েছেন Tachyon, যা সব সময়েই আলোর চেয়ে দ্রুত গতিতে চলে।

কোন মানুষকে যদি আলোর গতিবেগের কাছাকাছি কোন এক বেগে ভ্রমণ করান যায় তবে আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সাহায্যে তার শারীরিক ক্রিয়াকলাপ ধীরে ধীরে চলতে থাকে। অর্থাৎ সাধারণ স্থির মানুষের চেয়ে তার বয়স ধীরে ধীরে বাড়বে। এই ব্যাপারে একটা মজার উদাহরণ দেওয়া যাক্।

৩০ বছর বয়স্ক কোন মহাকাশচারী যদি আলোর গতি-বেগের কাছাকাছি কোন এক বেগে মহাকাশযাত্রা আরম্ভ করে তাহলে উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, তার শারীরিক ক্রিয়াকলাপও আস্তে আস্তে চলবে। ধরি মহাকাশচারী তার ঘড়ি অনুয়ায়ী ২ বছর পরে বাড়ী ফিরল, তাহলে তার বর্তমান বয়স হলো ৩২ বছর। কিন্তু বাড়ী ফিরে সে দেখে তার স্ত্রী, যাত্রার আগে যার বয়স ছিল 25 বছর সে এখন 75 বছরের বৃদ্ধা আর যাত্রার সময় তার কোন পুত্রের বয়স যদি 5 বছর থাকে তবে এখন তার বয়স হবে 55 বছর। "বাবার থেকে ছেলে বড়"—এটা কি সম্ভব? সত্যিই কি সব আজগুবি ব্যাপার—তাই না? আবার যদি সেই মহাকাশচারী আলোর গতিবেগের সমান বেগে চলতে থাকে তবে তার শারীরিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে যাবে—অর্থাৎ সে মরে যাবে। কিন্তু আবার তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনলে সে বেঁচে যাবে। তাহলেই ভাবুন তো, কেমন করে একজনকে যখন তখন মারা যায় আবার বাঁচানও যায়। এখন আর হাজার বছর আয়ু লাভে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো মানুষ এমন মহাকাশযান কখনও তৈরী করতে পারবে কিনা তা অনিশ্চিত অর্থাৎ কোন মহাকাশযানের গতিবেগ আলোর গতিবেগের বাধা অতিক্রম করতে পারে না। কারণ তাতে দরকার অসীম শক্তির যা এই পৃথিবীতে বসে সৃষ্টি করা অসম্ভব ব্যাপার। তবে যদি কোন দিন এইরকম মহাকাশযান তৈরী হয়, সেদিন মহাবিশ্বে ভ্রমণের স্বপ্ন তথা হাজার বছর আয়ুলাভের স্বপ্ন সফল হবে আমরা সবাই মিলে সেই আশা করব কি?

79, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলি-39

মাধ্যমিক পরীক্ষায় অঙ্ক নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই

নন্দলাল মাইতি

মাধ্যমিক পরীক্ষার আর বেশী দেরী নেই,—মাত্র দু-মাস। এই দু-মাস সময় পরীক্ষার্থীর পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ের মধ্যে পরীক্ষার্থীদের যথা সম্ভব সব বিষয়গুলিতে বিশেষভাবে প্রস্তুত হতে হয়। অবশ্য পরীক্ষা যতই এগিয়ে আসে, ততই কিছুটা দুশ্চিন্তা বাড়ে। আর সেই সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের পড়া ও লেখার গতিও বেড়ে যায়। বলা বাহুল্য, সবাই যথাসাধ্য প্রস্তুতি নেয়। সাধারণত প্রস্তুতি আসে নির্বাচনের মাধ্যমে,—বিশেষ বিশেষ অধ্যায় নির্বাচন, আর সেই সঙ্গে কিছু কিছু প্রশ্ন নির্বাচন। নির্বাচন দুরকমভাবে করতে হয় : সাধারণ আর বিশেষ। নির্বাচিত অংশ থেকে প্রশ্ন না এলেও যাতে উত্তর করা যায়, তার জন্যেই এরকম করা দরকার।

এতো গেল সব বিষয়ের উপর চিন্তা-ভাববা। কিন্তু অঙ্কের ক্ষেত্রে নম্বর বাড়াতে হলে ঠিক এরকমভাবে তৈরী হওয়া যায় না। অঙ্কে নির্বাচন করা দুরূহ, আর অসম্ভব বললেই চলে। ব্যতিক্রম জ্যামিতি। এখানে তবু নির্বাচন করা যায়। যাই হোক, অঙ্কের বেলায় ভুল-ভ্রান্তি, অনবধানতা, অসতর্কতার প্রতি নজর দিলে নম্বর বাড়ে,—অধিকতর সাফল্য আসে। কিন্তু পরীক্ষার হলে অঙ্ক কষতে কষতে "এই ভুল হলো" মনে করলে ভুল-ভ্রান্তি এড়ানো তো যাবেই না, বরং বিপদ আসবে। তাই ভুল-ভ্রান্তি, অসতর্কতার হাত থেকে রেহাই পাবার প্রয়াস বাড়ীতেই চালাতে হবে। বাড়ীতে অঙ্ক কষার সময় একটু সতর্ক হয়ে Step by Step মনঃসংযোগ করতে পারলে ভুল হয় না বললেই চলে। আর এ কথা তো সবার জানা, অঙ্কের সাফল্য আসে অনুশীলনে। যত বেশী অঙ্ক কষা যায়, আর বিভিন্ন ধরনের অঙ্ক কষা যায়, ততই অঙ্ক সহজ মনে হয় এবং অল্প সময়ে কষা যায়।

বিভিন্ন ধরনের অঙ্ক প্রচুর পরিমাণে করলে আমাদের অনেক লাভ হয়। এতে অঙ্কের প্রতি অকারণ ভয় কেটে যায় ; আত্মবিশ্বাস বাড়ে যার বিষয়টিতে দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জন করা যায়। এমন কি, পরীক্ষার আগেই হিসেব করা যায় বিষয়টিতে কত নম্বর পাওয়া সম্ভব।

আত্মবিশ্বাস অর্জনের জন্য তাই পরীক্ষার হলে এমন অঙ্কটি নির্বাচন করতে হয় যা অতি সহজেই কষা যায়। প্রথম অঙ্কটি হয়ে গেলেই মনে আনন্দ আসে, স্ফূর্তি আসে। সুতরাং অঙ্কের প্রশ্ন পেয়ে কোন কোন অঙ্ক বা জ্যামিতি বা ত্রিকোণমিতি প্রথমে করা হবে, তার নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় দেখা যায়, ভুল নির্বাচনের জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা কম নম্বর পায় বা তেমন সাফল্য লাভ করে না। প্রশ্ন যেমনই হোক, কঠিন বা সহজ, ধীর স্থির হয়ে নির্বাচন করে নিতে হয়। আবার অনেক ছাত্র-ছাত্রী রাফ করে। কিন্তু রাফ করা উচিত নয়। এতে অনেক সময় নষ্ট হয়। তা ছাড়া রাফ থেকে ফেয়ারে তুলতে ভুল হতেও পারে। প্রয়োজনীয় গণনা খাতার নিচের অংশে বা ডান দিকে রেখা টেনে নিয়ে করলে ভাল হয়। তাতে পরীক্ষকের পক্ষে অঙ্কটি পরীক্ষা করতে সুবিধা হয়, আর পরীক্ষার্থীরও ভুল হবার সম্ভাবনা কম থাকে।

পাটীগণিতের অঙ্কগুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায় : অনুপাত ও সমানুপাত, শতকরা, সুদকষা এবং লাভক্ষতি। এই চারটি ভাগ থেকে তিনটি অঙ্ক প্রতি বছর আসে। অনুপাত ও সমানুপাত এবং সুদকষা অধ্যায়ে অনেক ধরনের অঙ্ক আছে। এই সব অধ্যায়ে কিছু কিছু গতানুগতিক অঙ্ক আছে, আর কিছু জীবন-মুখী অঙ্ক। পরীক্ষার্থীরা এই ধরনের অঙ্ক যেন জোর দিয়ে কষে। তা ছাড়া অন্যান্য ধরনের অঙ্কগুলির অনুশীলন প্রয়োজন। মিশ্রণ, সম্ভূয় সমুত্থান, সুদকষা অঙ্ক তেমন কঠিন নয়। শতকরা ও লাভ-ক্ষতিতে একটি করে অধ্যায় থাকলেও এখানে নানা সমস্যামূলক অঙ্ক দেখা যায়। একমাত্র সমানুপাতে সূত্র আছে, আর সুদকষায় ; অন্যত্র নির্দিষ্ট কোন সূত্র নেই,—সমস্যা সমাধানের জন্য বার বার অঙ্কটি পড়ে অগ্রসর হতে হয়।

পরিমিতিতে সূত্রের অভাব নেই। আর সূত্রগুলি মনে না রাখলে অঙ্ক কষা যায় না। তাই সূত্রগুলি অনুশীলন করতে হবে অঙ্কের মাধ্যমে। বস্তুত, এখানে যে-সব অঙ্ক দেখা যায়, তাতে সূত্রের প্রয়োগ আর বীজ-গাণিতিক সমাধান ছাড়া কিছু নেই। তাই এই বিভাগ থেকে পুরো নম্বর পাওয়া কষ্টসাধ্য নয়।

এ বছর থেকে অঙ্কে ত্রিকোনমিতি অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এখানেও সূত্রের প্রাধান্য আছে, আর তার বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগ আছে। 'প্রমাণ কর' পর্যায়ের অঙ্ক, উচ্চতা ও দূরতা

নির্ণয় বিষয়ক অঙ্ক অবশ্যই আসবে। এই দুটি অধ্যায়ে মোট পঞ্চাশটি অঙ্ক অনুশীলন করলে পুরো নম্বর পাওয়া খুব সহজ।

বীজগণিতে দুটি উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে হয় অথবা গ. সা. গু. বা ল. সা. গু. নির্ণয় করতে হয়। যে-সব উৎপাদক বিশ্লেষণ থাকে, তার মধ্যে একমাত্র ত্রিঘাত রাশির উৎপাদক ছাড়া অন্যগুলি প্রায় সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীতে করতে হয়। তবে গ. সা. গু. নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ত্রিঘাত রাশি থাকলে ভাগ করে করাই ভাল। কিন্তু উৎপাদক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে প্রদত্ত রাশির যেন সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ হয়! তা না হলে নম্বর পাওয়া দুষ্কর। আর গ. সা. গু. বা ল. সা. গু. নির্ণয়ের ক্ষেত্রে উত্তরটি যেন ঠিক হয়। এখানে ভুল হলে নম্বর পাবে না!

সমীকরণ সমাধান থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা পুরো নম্বর পেয়ে থাকে। নবম শ্রেণীর একঘাত রাশির সমাধানের জন্য গোটা কুড়িক অঙ্কের অনুশীলন করলেই চলে। আর সহসমীকরণ প্রতি বছর আসে। এই সমীকরণ সমাধানের কয়েকটি নিয়ম থাকলেও অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী Vanishing পদ্ধতিতেই করে থাকে। আমার মনে হয়, আরো দু-একটি পদ্ধতি অবলম্বন করলে ভাল হয়। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, দুটি অজ্ঞাত রাশির মানই নির্ণয় করতে হবে,—একটি করলে চলবে না। দ্বিঘাত রাশির সমাধান বেশ সহজ। এখানেও অজ্ঞাত রাশির দুটি মান নির্ণয় করতে হবে,—ধনাত্মক আর ঋণাত্মক।

সমীকরণ ও অসমীকরণের লেখ দুটি সকলেই পারে। মনে রাখতে হবে উভয় প্রশ্নে নম্বরের ভাগ আছে। তাই দুটি অক্ষ, মূলবিন্দু, ছক কাগজের এককের উল্লেখ করতে ভুললে চলবে না। যার তিন জোড়া বিন্দু অবশ্যই নিতে হবে। এই তিন জোড়া বিন্দুর মধ্যে অন্তত এক জোড়া যেন ধনাত্মক-ঋণাত্মক হয়। অর্থাৎ ছক কাগজের বেশীর ভাগ জায়গা জুড়ে যেন লেখাচিত্রটি অঙ্কিত হয়। এতে অনেক ভুলের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এবারে করণীর অঙ্কের কথায় আসি। দশ থেকে পনেরোটা অঙ্ক কষলেই পুরো নম্বর পাওয়া যায়। সাধারণত অসমীকরণের লেখার সঙ্গে অথবা হিসেবে থাকে। অসমীকরণের লেখ করতে সময় নেয় বলে ভাল ছেলেরা সব সময় এই অঙ্কটি কষে।

জ্যামিতির সম্পাদ্যর সংখ্যা খুব কম,—মাত্র পাঁচ-ছটি। এই ক'টি সম্পাদ্যর অঙ্কন অভ্যাস করা কঠিন নয়। মনে রাখতে হবে চিহ্নগুলির প্রতি, আর চিত্রটি যেন সুন্দর হয়। সাধারণত অঙ্কন প্রণালী ও প্রমাণ দিতে হয় না। তবুও পড়ে রাখা দরকার। জ্যামিতির প্রধান প্রধান উপাদানগুলি নির্বাচন করা যায়। মনে হয়, একটু সতর্ক হয়ে নির্বাচন করলে দুটি উপপাদ্য অনায়াসে করা যায়। তবে অভ্যাসের সময় পুরো ছবি প্রথমে না এঁকে প্রয়োজন মত এঁকে প্রমাণ অভ্যাস করলে জ্যামিতি শেখা যায়। এখনো দু-মাস বাকী। তাই গোটা পনেরো উপপাদ্য নিয়ে অনুশীলন করা খুব কঠিন হবে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটি কথা বলে রাখি। একটি উপপাদ্যও প্রমাণ করতে না পারলে পরীক্ষার্থীরা যেন ছবিটুকু অন্তত খাতায় এঁকে আসে।

বস্তুমুখী গণিত অংশে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত গণিতের সিলেবাসের উপর খুব সহজ ও ছোট ছোট অঙ্ক থাকে। উর্ধ্ব-অধঃ ক্রমে সাজাও, সরল করে মান নির্ণয় কর, শতকরা, লাভক্ষতি সংক্রান্ত সব সহজ সহজ অঙ্ক। গ. সা. গু—ল. সা. গু সংক্রান্ত খুব সহজ অঙ্ক ইত্যাদি পাটীগণিতে পড়তে দেখা যায়। বীজগণিতে অসমীকরণের সমাধান সেট প্রতি বছর আসে। বিনিময়-সংযোগ-বিচ্ছেদ-বন্ধনী নিয়ম থেকে আসতে পারে, নিয়ন্ত্রিত সংখ্যার ধর্ম নিয়েও প্রশ্ন আসতে পারে; $(a+b)^2$ বা $(a+b)^3$ সংক্রান্ত অঙ্ক আসাও বিচিত্র নয়। জ্যামিতিতে কখন ত্রিবুজ অঙ্কন সম্ভব, বহুভুজের বাহু সংখ্যা, বহুভুজের অন্তঃকোণের সমষ্টি বা উপপাদ্যেও সূত্রাদির সাহায্যে কোণ নির্ণয়, বাহু নির্ণয় ইত্যাদি প্রায় সময় আসে। আমার মনে হয়, টেস্ট পেপার থেকে নির্বাচিত স্কুলের দশটি প্রশ্ন করলে এই বিভাগ থেকে দশ-বারো নম্বর পাওয়া খুব সহজ হয়ে ওঠে।

গত বছর বলেছিলাম অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে শতকরা পঞ্চাশ নম্বর পাওয়া কঠিন নয়। এবার কিন্তু আর একটু বেশী নম্বর পাওয়ার সুযোগ এসেছে ত্রিকোণমিতির অন্তর্ভুক্তির জন্য। আমার মনে হয়, পরীক্ষার্থীরা, যারা অবশ্য সাধারণ, চেষ্টা করলে গণিতে শতকরা ষাট নম্বর পেতে পারে। কিন্তু সব নির্ভর করছে তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, জেদ আর পরিশ্রমের উপর। আর ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি তাদের সজাগ হতে হবে। তা হলে পরীক্ষায় সাফল্য অবশ্যই আসবে। সে কারণে অঙ্ক নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

ঠাকুরাণীচক, হুগলী।

টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী / লেখা ও ছবি : গৌতম কর্মকার

খুদে বৈজ্ঞানিক

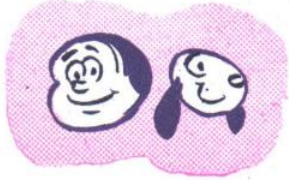

দিলীপ দাস

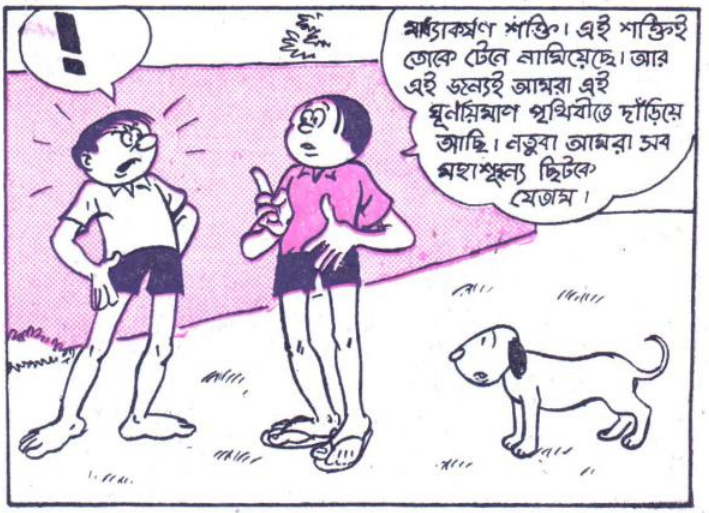

এর আবিষ্কার কর্তা কে জানিস? – স্যার আইজ্যাক্ নিউটন।
ঐ যে উল্লুকটা! উঁকি মেরে আমাকে আবার ভেংচি কাটছে!
কু–উ–ক্!
অ্যাই মদনা, কেমন হল?
?
এখন তোর ঐ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ওকে টেনে নামাতে পারছে না? যতোসব আমার বেলায়?
!
দ্যাখ তবে, তোর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জোর বেশী না আমার জোর বেশী!
অ্যাঁক্!
ধরেছি, এইবার পালাবে কোথায় বাছাধন!
কি সর্বনাশ! ওরে মদনা ওকে ছেড়ে দে। ও ভাবে টানাটানিতে শেষকালে দু'জনেই পড়ে মরবি!
দড়াম্
উফস্!
আঁই!
আউমচ্!
ফ্র্যাঁচা?! তবুও এদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তত্ত্ব বোঝানো গেল না!

বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র : লেখা ও ছবি / দিলীপ দাস

জগদীশচন্দ্রের প্রতি ইংরেজ কর্মচারীদের বৈষম্যমূলক আচরণে নিবেদিতা বরাবরই ক্ষুব্ধ ছিলেন।

1984—মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর জন্য

ভৌত বিজ্ঞান ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

অমরনাথ রায়

[গ্রুপ-এ]

1. (a) পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে কি কি কণিকা থাকে? কোন্ কণিকার প্রকৃতি কিরূপ? কোন্ প্রাথমিক কণা সবচেয়ে হাল্কা?

(b) একটি মৌলের পরমাণু ক্রমাঙ্ক 17 এবং ভর সংখ্যা 35, মৌলটির নিউক্লিয়াসের গঠন কিরূপ? মৌলটির নাম লিখ।

(c) পরমাণু নিউক্লিয়াসের মধ্যে কি ইলেকট্রন থাকিতে পারে? না থাকিলে, ইলেকট্রনগুলি কোথায় থাকে?

(d) 'আইসোটোপ' কাহাকে বলে? এমন কয়েকটি মৌলের নাম লিখ যাহাদের আইসোটোপ আছে। হাইড্রোজেনের আইসোটোপগুলির নাম লিখ ও গঠন বর্ণনা কর। পরমাণুর ভরসংখ্যা ও পরমাণু ক্রমাংক কাহাকে বলে?

2. (a) চার্লস ও বয়লারের সূত্র লিখ।

(b) প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতা, পরমশূন্য এবং পরম স্কেল কাহাকে বলে? পরম স্কেলের অপর নাম কি?

(c) অ্যাভোগাড্রোর প্রকল্পটি লিখ। অ্যাভোগাড্রোর সংখ্যা কাহাকে বলে? উহার মান কতো? প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় যে কোন গ্যাসের গ্রাম আণবিক আয়তন কতো?

(d) কোন গ্যাসের অণুগুলির গতিবেগ বাড়াইতে হইলে কি করিতে হইবে? গ্যাসের আয়তন স্থির রাখিয়া অনুগুলির গতিবেগ বাড়াইলে কি হইবে? মৌল বলিতে কি বুঝ?

3. (a) বাষ্পীভবন ও স্ফুটনের মধ্যে পার্থক্য কি? 'তরলে স্ফুটনাংক চাপের উপর নির্ভরশীল'—এই উক্তির সত্যতা পরীক্ষা উল্লেখ করিয়া প্রমাণ কর।

(b) গলনাঙ্কের সংজ্ঞা লিখ। বরফের গলনাঙ্কের উপর চাপ বৃদ্ধির কিরূপ প্রভাব পড়ে? ইহা বুঝাইবার জন্য একটি পরীক্ষা উল্লেখ কর।

(c) তাপ ও উষ্ণতার প্রভেদ কি? তাপের যান্ত্রিক তুল্যাংক কি? তামার উপেক্ষিক তাপ 0.09 বলিতে কি বুঝ? বরফের গলনের লীনতাপ 80 ক্যালরি গ্রাম বলিতে কি বুঝ? পাহাড়ের উপর রান্না করতে বেশী সময় লাগে কেন?

4, (a) 'প্রেসার কুকার' কোন নীতিতে কাজ করে? কার্য বলিতে কি বুঝ? বলের পক্ষে ও বলের বিরুদ্ধে কার্যের উদাহরণ দাও।

(b) ভর, ওজন ও বলের সংজ্ঞা লিখ। মেট্রিক পদ্ধতিতে ও এফ. পি. এস. পদ্ধতিতে বলের এককগুলির নাম লিখ। অভিকর্ষজ ত্বরণের মান কতো? দ্রুতি ও বেগের মধ্যে পার্থক্য কি?

(c) পরীক্ষা দ্বারা ভরের নিত্যতা সূত্র প্রমাণ কর। ম্যাগনেসিয়ামকে বায়ুতে দহন করিলে উহার ভস্মের ওজন গৃহীত ম্যাগনেসিয়ামের ওজন অপেক্ষা বেশী হয় কেন? ইহা কি ভরের নিত্যতা সূত্রের পরিপন্থী?

5. (a) হাতে স্পিরিট ঢালিলে হাত ঠাণ্ডা হয় কেন? মাটির কলসীর জল ঠাণ্ডা হয় অথচ পিতলের ঘোড়ায় রাখা জল ঠাণ্ডা হয় না কেন?

যান্ত্রিক শক্তি হইতে তাপশক্তির রূপান্তরের একটি উদাহরণ দাও।

(c) লোহার পারমাণবিক গুরুত্ব 55.85 বলিতে কি বুঝ?

[গ্রুপ বি]

6. (a) লিভার কাহাকে বলে? দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর লিভারের বর্ণনা দাও। উহাদের প্রত্যেকের দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও। 'যান্ত্রিক সুবিধা' বলিতে কি বুঝ? মানুষের হাত নলকূপের হাতল, জাঁতি, কাঁচি কোনটি কোন্ শ্রেণীর লিভার? যান্ত্রিক সুবিধা কম হওয়া সত্ত্বেও তৃতীয় শ্রেণীর লিভার ব্যবহার করা হয় কেন?

(b) নিম্নলিখিতগুলির সংজ্ঞা লিখ ঃ

দ্রুতি, বেগ, ত্বরণ, মন্দন, অভিকর্ষজ ত্বরণ, বল ও কার্য।

(c) আলোকের প্রতিফলন ও প্রতিসরণ বলিতে কি বুঝ? আলোকের নিয়মিত প্রতিফলনের সূত্রগুলি লিখ।

সদ্ ও অসদ্ প্রতিবিম্ব কাহাকে বলে? উত্তল লেন্সের ফোকাসের সংজ্ঞা লিখ। কেমন করিয়া উত্তল লেন্স সদ্ ও অসদ্ প্রতিবিম্ব গঠন করে, তাহা চিত্রসহ বুঝাও। আলোকের বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন কাহাকে বলে? সিনেমার পর্দা অমসৃণ করার কারণ কি?

7. (a) একটি চৌবাচ্চা জলে ভর্তি থাকিলে উহার গভীরতা কম বলিয়া বোধ হয় কেন? চিত্র সহযোগে বুঝাও। সূর্যালোকিত দিবসে একটি মিটার স্কেলের সাহায্যে কি ভাবে উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব নির্ণয় করিবে?

(b) চিত্র আঁকিয়া 'সংকট কোণ' ও অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন বোঝাও। আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের শর্তগুলি লিখ।

(c) আলোকের বিচ্ছুরণ ও বর্ণালী কাহাকে বলে? প্রিজমের মধ্য দিয়া সূর্যরশ্মি পাঠাইলে ঐ রশ্মির বর্ণালি কিভাবে গঠিত হয় তাহা চিত্র সহযোগে বুঝাও।

শব্দের বেগ কি ভাবে নির্ণয় করা যায়? প্রতিধ্বনি কি এবং উহা কিভাবে উৎপন্ন হয়? শব্দের প্রতিধ্বনি শুনিতে হইলে প্রতিফলক ও শ্রোতার মধ্যে নূন্যতম দূরত্ব কতো হওয়া প্রয়োজন? সুরযুক্ত শব্দের 'জাতি' কিসের উপর নির্ভর করে?

(b) শব্দের কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কাহাকে বলে। উহাদের এককগুলির নাম লিখ। সুরযুক্ত শব্দের দুইটি বৈশিষ্ট্য লিখ। শব্দের প্রতিফলনের ব্যবহারিক প্রয়োগ চিত্র সহযোগে বুঝাও। চাপ ও উষ্ণতার পরিবর্তন বায়ুতে শব্দের বেগকে কিরূপে প্রভাবিত করে? শব্দের বেগ বায়ুতে বেশী, না লোহায় বেশী?

(c) জুলের সূত্রগুলি লিখ। ওহ্‌মের সূত্র লিখ। একটি পরিবাহীর রোধ 10 ওহ্‌ম। ইহার ভেতর দিয়া 5 অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহিত করিলে বিভব প্রভেদ কতো হইবে? ফ্লেমিং এর বাম হস্ত এবং অ্যাম্পিয়ারের সন্তরণ নিয়ম লিখ।

9. (a) বার্লো চক্রের কার্য প্রণালী চিত্রসহ বুঝাও। 'রোধ' কাহাকে বলে? ইহার দ্বারা কিরূপে তড়িৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়? সমান দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট তারের একটির প্রস্থচ্ছেদ অপরটির দ্বিগুণ হইলে উহাদের রোধের অনুপাত কতো হইবে?

(b) ওরস্টেডের পরীক্ষা বর্ণনা কর। একটি ধাতব তার ও ব্যাটারীর সাহায্যে চুম্বকের উত্তর মেরু কি ভাবে নির্ণয় করিবে? তড়িৎচুম্বক কাহাকে বলে? উহা কিরূপে প্রস্তুত করা হয় এবং কি কাজে লাগে?

(c) ক্যাথোড রশ্মির প্রকৃতি কিরূপ? উহার কয়েকটি ধর্ম উল্লেখ কর। এক্স রশ্মির ব্যবহার, ধর্ম ও প্রকৃতি কিরূপ তাহা লিখ। ইহা কি ভাবে উৎপন্ন করা যায় তাহা চিত্র সহযোগে বুঝাও।

[গ্রুপ-সি]

10. (a) মেণ্ডেলিফের পর্যায় সূত্র এবং উহার সংশোধিত রূপটি লিখ। পর্যায় সারণীর উপযোগিতা কি? নিষ্ক্রিয় মৌলগুলি পর্যায় সারনীর কোন্ গ্রুপে থাকে? এই সাররণীতে মোট কয়টি পর্যায় ও কয়টি গ্রুপ আছে?

(b) জারণ ও বিজারণ কাহাকে বলে? উদাহরণ সহযোগে জারণ ও বিজারণ ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। প্রশমন ক্রিয়া কাহাকে বলে? লবন কাহাকে বলে? একটি শমিত লবন ও একটি অ্যাসিড লবণের নাম ও সংকেত লিখ।

(c) তড়িৎ যোজ্যতা ও সমযোজ্যতা উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর। সমযোজী ও তড়িৎযোজী যৌগগুলির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। নিচের কোন্‌টি তড়িৎযোজী এবং কোন্‌টি সমযোজী যৌগ?

$CaCl_2$, CCl_4, MgO, NaF, Hcl, NH_3, H_2O,

11. (a) তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ ও বহুরূপতা বলিতে কি বুঝ? উভয়েরই দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও। সংপৃক্ত ও অসংপৃক্ত দ্রবণ কাহাকে বলে। একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় সংপৃক্ত দ্রবণকে কি ভাবে অসংপৃক্ত করা যায়?

(b) 'তড়িৎলেপন' কাহাকে বলে? উহার ব্যবহারিক প্রয়োগ লিখ। তাপদায়ী ও তাপশোষী পরিবর্ত্তন কাহাকে বলে, উদাহরণ সহযোগে বুঝাও। 'নির্দেশক' কাহাকে বলে? কস্টিক সোড়া দ্রবনে ফিনপথ্যালিন যোগ করিলে বর্ণের কিরূপ পরিবর্তন ঘটিবে?

12. (a) পরীক্ষাগারে H_2S গ্যাস উৎপন্ন করার প্রয়োজনীয় উপাদান গুলির নাম লিখ। কিপ্ যন্ত্রে কোন্ কোন্ গ্যাস প্রস্তুতি করা হয়? পরীক্ষাগারে কিরূপে Hcl গ্যাস প্রস্তুত করা হয়? কিরূপ ঐ গ্যাসকে সনাক্ত করা যায়? $KclO_3$ হইতে অক্সিজেন প্রস্তুতিতে MnO_2 এর ভূমিকা কি? প্রমাণ কর যে H_2S একটি বিজারক পদার্থ।

(b) অ্যামোনিয়া ঐ নাইট্রিক অ্যাসিডকে কিভাবে

সনাক্ত করা যায়? সিলভার নাইট্রেট দ্রবণের সহিত Hcl এর বিক্রিয়ায় কি ঘটে, সমীকরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর।

(c) সংস্পর্শ পদ্ধতিতে কিরূপে H_2SO_4 এর পণ্যোৎপাদন করা হয়? প্রমাণ কর যে H_2SO_4 একটি জলাকর্ষী পদার্থ। H_2SO_4-এর সহিত $BaCl_2$ এবং $CaCO_3$ এর পৃথক পৃথক বিক্রিয়া সমীকরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর।

13. (a) তামার দুইটি প্রধান আকরিকের নাম ও সংকেত লিখ। ঐ ধাতুর কয়েকটি ব্যবহার উল্লেখ কর। তামার সহিত লঘু HNO_3 এর বিক্রিয়ার সমীকরণ লিখ। দস্তা ও অ্যালুমিনিয়ামের দুইটি করিয়া আকরিকের নাম ও ব্যবহার লিখ। কি ভাবে 'দস্তালেপন' করা হয়? দস্তা লেপনের উপযোগীতা কি? দস্তাকে কস্টিক সোডা দ্রবণের সহিত উত্তপ্ত করিলে কি হইবে? অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণকে জল সহযোগে ফুটাইলে কি পাওয়া যাইবে?

(b) সংকর ধাতু কাহাকে বলে? নীচের সংকর ধাতুগুলির উপাদান ও ব্যবহার লিখ;

কাঁসা, পিতল, ব্রোঞ্জ, জার্মান সিলভার ও ইস্পাত।

(c) নীচের যৌগগুলির দুইটি করিয়া ব্যবহার লিখ;

কস্টিক সোডা, ব্লিচিং পাউডার, তুঁতে, অ্যামোনিয়াম সালফেট ও মেথিলেটেড স্পিরিট।

14. (a) নীচের পদার্থগুলির উৎস ও দুইটি করিয়া ব্যবহার লিখ:

ফেনল, ন্যাপথ্যালিন, ইউরিয়া, গ্লিসারল, ভিনিগার, ক্লোরোফর্ম ও বেনজিন্।

(b) মেথিলেটেড স্পিরিট ও রেকটিফায়েড স্পিরিটের মধ্যে পার্থক্য কি? একটি সংপৃক্ত ও একটি অসংপৃক্ত হাইড্রো-কার্বন যৌগের নাম ও গঠন সংকেত লিখ। জৈব ও অজৈব যৌগের মধ্যে পার্থক্য কি? জৈব যৌগের বৈশিষ্ট্যগুলি লিখ।

(c) যুক্তি দ্বারা বুঝাও, কোনটি রাসায়নিক ও কোনটি ভৌত পরিবর্তন:

(i) চুনকে জলে ফেলা হইল (ii) কর্পূরকে তাপ দেওয়া হইল (iii) চিনি জলে দ্রবীভূত করা হইল (iv) লোহায় মরিচা পড়িল।

স্বাভাবিক উষ্ণতার সংস্পর্শে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটার একটি উদাহরণ দাও।

নিউট্রাফিক, খড়গপুর,

• মজার ছবি •

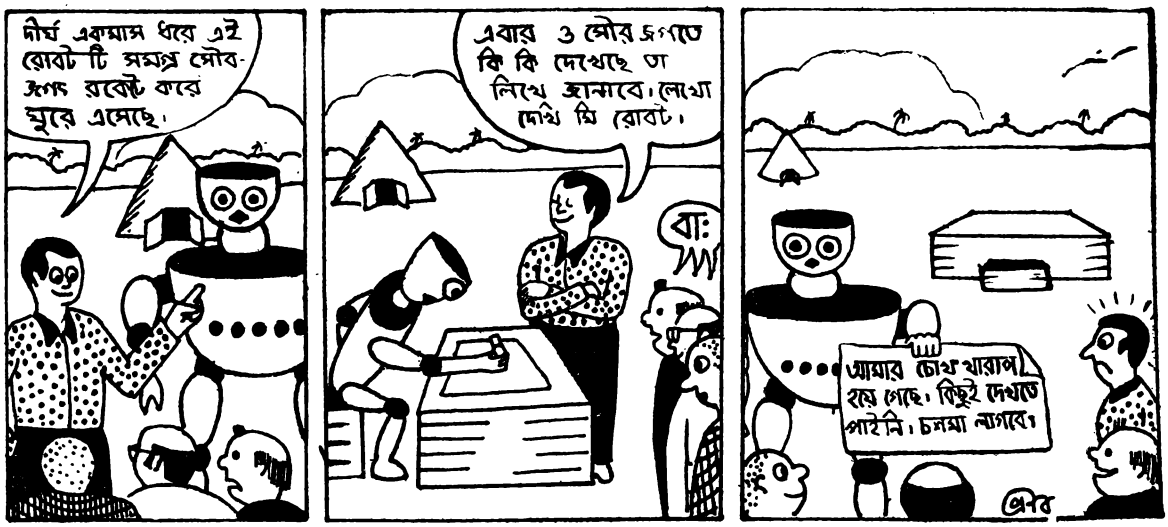

আগ্নেয়গিরি

স্বপনকুমার মুখার্জী

1902 সালের 8ই মে সকাল সাড়ে সাতটা। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সেণ্টপিরে শহরের চল্লিশ হাজার বাসিন্দা সভয়ে লক্ষ্য করলেন শহরের পেছন দিকের পিলি (pelie) পর্বত শৃঙ্গে ঘন ঘন বিস্ফোরণের আওয়াজ। কিছুক্ষণের মধ্যেই পিলি শৃঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলো দফায় দফায় উত্তপ্ত গলিত লাভা, ধেয়ে এলো শহরের দিকে। আকাশ ভরে উঠলো কালো ধোঁয়ায়। চারদিকে উড়তে লাগলো ছাই ও সেই সঙ্গে তীব্র গন্ধকের গন্ধে ভরে গেলো চারদিক। যখন সব কিছু শান্ত হোল, দেখা গেলো শহরের চল্লিশ হাজার বাসিন্দা আগ্নেয়গিরির কবলে মৃত। ধ্বংস হয়ে গেছে মানবসভ্যতা। গত চারশো বছরে প্রায় পাঁচশো বার অগ্নুৎপাত হয়েছে আমাদের পৃথিবীতে। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর 1815 সালে ইষ্ট ইণ্ডিজের টামব্রো (Tamboro) শহরে যে অগ্নুৎপাত হয় তাতে 56 হাজার লোক প্রাণ হারায়।

আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্নুৎপাতের এই ভয়াবহ রূপ দেখে মানুষ বহুদিন ধরেই চেষ্টা করেছে জানতে কি এই আগ্নেয়গিরি, কেন এই অগ্নুৎপাত। আজ মানুষ চেষ্টা করছে অগ্নুৎপাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে এমনকি তাকে নিজের প্রয়োজনে কাজে লাগাতেও।

তোমরা অনেকেই জানো যে পাহাড় বা কোনকৃতি কোন জায়গা যার মধ্যকার একটি ছিদ্র (pipe) থেকে যখন উত্তপ্ত গলিত তরলপদার্থ, কঠিন পাথরের টুকরো ও নানা গ্যাসীয় পদার্থ প্রচণ্ড চাপ ও তাপের সঙ্গে বেরিয়ে আসে তাকে অগ্নুৎপাত বলে এবং যে জায়গা থেকে অগ্নুৎপাত হয় তাকে আগ্নেয়গিরি বলে। আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আসা তরল পদার্থের নাম লাভা (Lava)। লাভার তাপক্রম হয় 1000—1200 ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড। বিভিন্ন আগ্নেয়গিরির লাভাও ভিন্ন ধরণের হয়। কোথাও ঘন লাভা যা কয়েক সেণ্টিমিটার প্রতি ঘণ্টায় চলে, কোথাও খুব তরল যা ঘণ্টায় 20 কিলোমিটার বেগে ধেয়ে আসে। এই লাভাই যখন পরে জমে শক্ত পাথর হয় সেই পাথরের নাম ব্যাসাল্ট বা রাওলাইট। আগ্নেয় গিরি থেকে বিভিন্ন আকারের ছোট বড় পাথরের টুকরোও প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে আসে। বড় বড় টুকরোগুলিকে বলে volcanic bomb ও মিহি বা ছোট টুকরো গুলিকে বলে Sand বা ash। যে সব গ্যাসীয় পদার্থ আগ্নেয়গিরি থেকে বেরোয় তার মধ্যে আছে ক্লোরিন, অ্যামোনিয়া, সালফার ডাই অক্সাইড এবং প্রচুর জলীয় বাষ্প।

কেবল যে ভূপৃষ্ঠেই অগ্নুৎপাত হয় তা নয়, সমুদ্রের ভেতরেও প্রচুর অগ্নুৎপাত হয় জলের নীচে ডুবন্ত পাহাড়ের মুখ থেকে।

আগ্নেয়গিরির ঠিক মুখে যেখান থেকে লাভা বেরোয় ও পরে একটা গর্ত্ত দেখা দেয় তাকে বলে ক্র্যাটার (Crater) এবং যে পথ ধরে পাহাড়ের ভেতর থেকে লাভা বেরিয়ে আসে তাকে বলে পাইপ (pipe)। ক্র্যাটার সাধারণতঃ আকারে চায়ের ডিসের মত হয় এবং ব্যাস কয়েকশ ফিট হতে কয়েক মাইল পর্যন্ত হয়। যে সব আগ্নেয়গিরি থেকে ঘন ঘন অগ্নুৎপাত হয় তাকে জীবন্ত আগ্নেয়গিরি Cactiv volcano বলে। যে সব আগ্নেয়

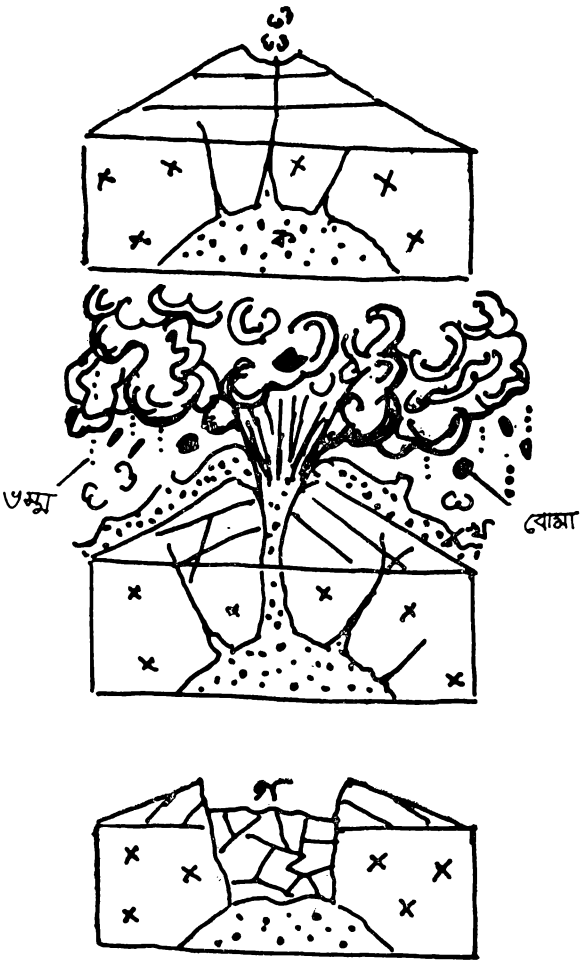

আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্নুৎপাতের বিভিন্ন ধাপ—(ক) ম্যাগমা অগ্নুৎপাতের ঠিক পূর্বে (খ) লাভা—অগ্নুৎপাতের সময় (গ) ক্র্যাটার—অগ্নুৎপাতের পর।

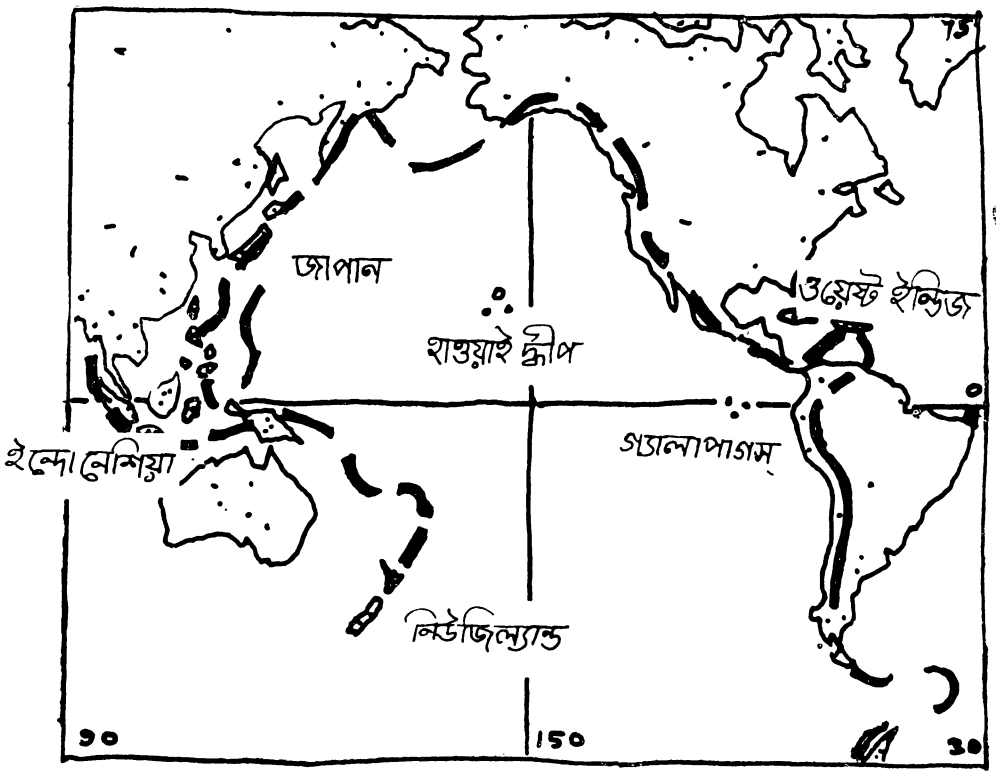

রিং অব ফায়ার। প্রশান্ত মহাসাগরের চারপাশের আগ্নেয়গিরিমালা

গিরি থেকে মাঝে মধ্যে অগ্নুৎপাত হয় বহু বছর পর পর, তাকে বলে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি (dornant volcano) এবং যে সব আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্নুৎপাতের সম্ভাবনা ভবিষ্যতে আর নেই তাকে বলে মৃত (extinct volcano) আগ্নেয়গিরি।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে মাটির নীচে চাপ ক্রমশ বাড়তে থাকে। ভূপৃষ্ঠ থেকে 16 মাইল এর পর নীচের অংশের নাম ম্যানটল (Mantle) এবং এটা প্রায় 1800 মাইল গভীর। চাপের ফলে ম্যানটলের অংশ অনেকটা ঘন তরল থাকে। যদি কোন প্রাকৃতিক কারণে (যেমন পাথরের চ্যুতি-বিচ্যুতি ইত্যাদি) ম্যানটলের ওপরের চাপ কমে যায় অথবা কোন কারনে নীচের ম্যানটলের চাপ হঠাৎ বেড়ে যায় (যেমন তেজস্ক্রিয়তা বা গরম বাষ্প সৃষ্টি ইত্যাদি) ম্যানটলের তরল পদার্থ সবেগে বাইরে বেরিয়ে আসে আগ্নেয়গিরির রূপ নিয়ে। নির্গত হয় লাভা ভূপৃষ্ঠের বাইরে।

একটা মজার ব্যাপার লক্ষ করা গেছে যে পৃথিবীতে যত জীবন্ত, আগ্নেয়গিরি আছে তা কয়েকটি জায়গায় (দুটি বেল্টে) সীমাবদ্ধ। একটি বেল্ট (belt) প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্ত্তী যেখানে পৃথিবীর সব জীবন্ত আগ্নেয়গিরিগুলি রয়েছে, যার জন্য এর নাম রিং অফ ফায়ার (ring of fire) এটা শুরু হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার কেপ হর্ন হতে, পশ্চিম দিক ধরে অ্যালুটিয়ান দ্বীপের কাছে বাঁক খেয়ে জাপান হয়ে ইষ্ট-ইণ্ডিজ পর্যন্ত। অপর একটি বেলট রয়েছে ইষ্ট ইণ্ডিজ হতে শুরু হয়ে এশিয়া—মইনর দিয়ে ভুমধ্যসাগর অঞ্চল পেরিয়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ পর্যন্ত। এছাড়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু কিছু জীবন্ত আগ্নেয়গিরি কয়েকটা রয়েছে নিউজি-ল্যাণ্ডে, আইসল্যাণ্ডে ও আণ্টার্টিকায়। আমাদের ভারত বর্ষে কিন্তু কোন জীবন্ত আগ্নেয়গিরি নেই। কয়েকটা যুক্ত আগ্নেয়গিরির সন্ধান পাওয়া গেছে আন্দামান দীপপুঞ্জের কাছাকাছি বঙ্গোপসাগরের মাঝে।

অগ্নুৎপাত এর ভয়াবহ রূপ দেখে মানুষ চেষ্টা করে চলেছে নিজেকে রক্ষা করতে। অগ্নুৎপাত কখনও কোথায় হতে পারে এবং সে সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যতবাণী করা যায় কিনা মানুষ চেষ্টা করে চলেছে। আমরা জানি যে

অগ্নুৎপাত প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ যে দুটি আগ্নেয়গিরি বেল্টের কথা আগেই বলা হয়েছে তাতেই। হঠাৎ করে যেখানে সেখানে অগ্নুৎপাত হয় না। সাইমোগ্রাফ (Seismograph) যন্ত্রের সাহায্যে আগে থেকে বলা যায় অগ্নুৎপাত হতে পারে কিনা এবং কোন যায়গায় হবে। অগ্নুৎপাতের পূর্বে যে ভূকম্পন শুরু হয় তা ধরা পড়ে সাইমোগ্রাফ যন্ত্রটিতে। মেক্সিকো ও হাওয়াই দ্বীপের বহু অগ্নুৎপাতের ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছিলো এই সাইমোগ্রাফের সাহায্যে। টিল্টমিটার (tiltmetre) যন্ত্রের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের পাথরের চ্যুতি-বিচ্যুতি ধরা পড়ে যা থেকে ভূমিকম্প ও অগ্নুৎপাতের আন্দাজ করা যায়। যদি আগে থেকে অগ্নুৎপাতের সর্তকতা মেলে তবে আমরা নানা ব্যাখা গ্রহণ করতে পারি নিজেদের রক্ষা করতে। যেমন 1616 খৃষ্টাব্দে সিসিলি (Sicily) তে অগ্নুৎপাতের ভবিষ্যৎবাণী হওয়ার পর স্থানীয় লোকেরা বড় বড় ট্যানেল (tunncl) কেটে লাভার গতিপথ পাল্টে দেয়। জাভাতেও এরকম ভবিষ্যত বানী হওয়ার পর স্থানীয় লোকেরা ড্যাম (dam) তৈরী করে লাভাস্রোত থেকে কৃষিক্ষেত্র ও গ্রাম সহুহকে রক্ষা করার জন্য। লাভা-স্রোত কে ধ্বংস করার জন্য বিমানে করে বোমা ফেলে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছে আরেরিকার বিমান বাহিনী।

অগ্নুৎপাতের দরুণ প্রচুর তাপ ও চাপের সৃষ্টি হয়। সেই নির্গত তাপ ও চাপ শক্তিকে মানুষ নিজের কাজে লাগাবার চেষ্টা করে চলেছে। আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত উত্তপ্ত বাষ্পকে ব্যবহার করা হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ইতালিতে। ইতালির তাসকেনিতে (tuscany) এই বাষ্প থেকে 1 লক্ষ কিলো ওয়াট পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়েছে। আইসল্যাণ্ডে (Iceland) এই উত্তপ্ত বাষ্পকে কাজে লাগানো হয়েছে ঘর বাড়ী, জলের পাইপ লাইন ইত্যাদি গরম রাখার জন্য। এছাড়া গন্ধক, (Sulphur) বোরাক্স (Borax), বোরিক অ্যাসিড (Boric acid) আমোনিয়াম কার্বোনেট প্রভৃতি রাসায়নিক বস্তু ও সংগ্রহ করা হয় অগ্নুৎপাত জনিত নির্গত গ্যাস হতে।

আগ্নেয়গিরি যদিও মানব সভ্যতার বিপদ তবুও মানুষ তার কাছে নতি স্বীকার করেন নি। আগ্নেয়গিরি থেকে সে যে কেবল নিজেকে রক্ষা করতে শিখেছে তা নয় বরং অগ্নুৎপাতকে নিজের কাজে লাগাতেও চেষ্টা করে চলেছে। হয়তো এমন দিন আসবে যখন অগ্নুৎপাত জনিত তাপও চাপ শক্তি দ্বারা কল-কারখানা চলবে।

স্টীল অথরিটি অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড, রাঁচী

মজার খেলা

॥ ইংরাজী সালের তারিখ হইতে দিন নির্ণয় ॥

1984 সাল এসে গেল। তাই দেখা যাক কিভাবে যে কোন ইংরাজী মাসের তারিখ হইতে দিন নির্ণয় করা যায়। তবে তাহার জন্য 12 খানা সংখ্যা মনে রাখিতে হইবে। একটি সংখ্যা কেবল একটি মাসের জন্য প্রয়োগ হইবে।

জানুয়ারী	'84 মাসের জন্য নির্ধারিত সংখ্যা	= 0
ফেব্রুয়ারী	'84	= 3
মার্চ	'84	„ = 4
এপ্রিল	'84	= 0
মে	'84	= 2
জুন	'84	= 5
জুলাই	'84	„ „ = 0
আগষ্ট	'84	„ = 3
সেপ্টেম্বর	'84	= 6
অক্টোবর	'84	= 1
নভেম্বর	'84	= 4
ডিসেম্বর	'84 „ „ „ „	= 6

এইবার, যে কোন মাসের যে কোন তারিখের দিন নির্ণয় করিতে হইলে, তারিখ সংখ্যাটির সহিত এ মাসের জন্য নির্ধারিত সংখ্যাটি যোগ করিতে হইবে। যোগফলকে 7 দ্বারা ভাগ করিতে হইবে। যত ভাগশেষ থাকিবে, সপ্তাহের তত নং দিনটিই হইবে নির্ণেয় দিন। কোন ভাগশেষ না থাকিলে, দিনটি শনিবার হইবে।

উদাহরণ :—(i) ফেব্রুয়ারী '84 মাসের 28 তারিখ কি বার হইবে? নিয়ম অনুযায়ী 28 সংখ্যাটির সহিত ফেব্রুয়ারী মাসের জন্য নির্ধারিত সংখ্যা 3 যোগ করা হইল। যোগফল হইল 31 (28 + 3)। 31 কে 7 দ্বারা ভাগ করা হইল, ভাগশেষ হইল 3। সপ্তাহের 3নং দিনটি হইল, মঙ্গলবার।

নির্ণেয় দিনটি হইল মঙ্গলবার।

উদাহরণ (ii)—সেপ্টেম্বর মাসের 29 তারিখ কি বার হইবে? 29-র সহিত সেপ্টেম্বরের নির্ধারিত সংখ্যা 6 যোগ করা হইল। যোগফল হইল 35 (29 + 6)। 7 দ্বারা ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না। দিনটি শনিবার হইবে।

কোন তারিখ মাসের প্রথম সপ্তাহে থাকিলে, তারিখটির সহিত নির্ধারিত সংখ্যা যোগ করিলে 7 দ্বারা ভাগ যাইবে না। সেক্ষেত্রে তারিখটির সহিত নির্ধারিত সংখ্যাটি যোগ করিয়া যত হইবে সপ্তাহের ততনং দিনই নির্ণেয় দিন। হিসাবে, রবিবারকে সপ্তাহের প্রথম দিন (1নং) ধরা হইয়াছে।

1984'র মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর জন্য

জীবন বিজ্ঞান ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

দিনোজকুমার দে

1. (a) সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কি কি উপাদানের প্রয়োজন হয়? এই প্রক্রিয়ার রাসায়নিক সমীকরণটি লিখ। সালোকসংশ্লেষকে অঙ্গার-আত্তীকরণ পদ্ধতি বলা হয় কেন? সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার শর্তগুলি কি কি? সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার তাৎপর্য কি?

(b) উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদে কিভাবে অক্সিজেনের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। শ্বাসকার্যে গ্লাইকোলিসিস প্রক্রিয়ার তাৎপর্য কি? চিত্রসহ মানুষের শ্বাসতন্ত্রের বর্ণনা দাও। কি কারণে পরিশ্রম করলে শ্বাসকার্যের হার বৃদ্ধি পায়?

2. (a) ম্যাক্রোএলিমেণ্ট ও মাইক্রোএলিমেণ্ট বলিতে কি বোঝ? যে কোন চারটি অধাতব মৌলিক উপাদানের নাম কর ও উহাদের কার্যকারিতা উল্লেখ কর।

(b) উৎসেচক কাহাকে বলে? কত প্রকার ও কি কি? উৎসেচকের বৈশিষ্ট্যগুলি লিখ। অ্যাপো ও কোএনজাইম বলিতে কি বোঝ? মানুষের পৌষ্টিকনালীতে কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিন পরিপাকের বর্ণনা দাও। উদ্ভিদ ও প্রানী পুষ্টির মধ্যে কি কি পার্থক্য দেখা যায়?

3. (a) সংবহন কাহাকে বলে? সংবহনের প্রয়োজনীয়তা কি? এককোষী জীবদের সংবহনের প্রয়োজন হয় না কেন? উদ্ভিদের সংবহন কলা কি কি? কিভাবে উন্নত উদ্ভিদে মূল দ্বারা শোষিত রস পাতায় গিয়ে পৌঁছায়?

(b) রক্ত কাকে বলে? রক্তের কয়টি উপাদান ও কি কি? রক্তের কাজগুলি কি কি? বদ্ধ ও মুক্ত সংবহন কাকে বলে? রক্তের রঙ লাল কেন? মানুষের রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কত? কিসের উপর ভিত্তি করিয়া রক্তের শ্রেণীবিভাগ করা হয়? সার্বজনীন দাতা ও গ্রহীতা বলিতে কি বোঝ? অ্যাণ্টিজেন ও অ্যাণ্টিবডির মধ্যে পার্থক্য কি? কিভাবে রক্ততঞ্জন ঘটে? হিমোগ্লোবিন ও হিমোসায়ানিনের মধ্যে পার্থক্য কি? লসিকা কি? সিস্টেমিক ও পোর্টাল সংবহনের মধ্যে পার্থক্য কি?

4. গমনে সক্ষম দুটি উদ্ভিদ ও গমনে অক্ষম দুটি প্রাণীর নাম লিখ। প্রোটোপ্লাজমের চলনকে কি বলে? ক্ষণপদের সাহায্যে গমন করে কোন উদ্ভিদ? অ্যামিবা, কেঁচো, আরশোলা ও মাছের গমন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

5. (a) রেচন কাহাকে বলে? উদ্ভিদের রেচন কৌশলগুলি কি কি? উদ্ভিদের রেচন পদার্থ প্রাণীদের কি ভাবে কাজে লাগে? উপক্ষার কি? কয়েকটি উপক্ষারের উৎস্য ও তাদের বাণিজ্যিক গুরুত্ব আলোচনা কর।

(b) মেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রধান রেচন অঙ্গ কি? অ্যামিবা, হাইড্রা, কেঁচো, চ্যাপ্টাকৃমি, আরশোলা ও চিংড়ির রেচন অঙ্গ কি? চিত্রসহ নেফ্রনের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও। ম্যালপিজিয়ান ফরপাসল্-এর প্রধান কার্য কি?

6. মাটি কাকে বলে? কি ভাবে মাটির উৎপত্তি হয়? উৎপত্তি অনুসারে মাটি কয় প্রকার? স্থানীয় মৃত্তিকার উদাহরণ দাও। মাটির উপাদানগুলি কি কি? প্রত্যেক প্রকার মাটির বর্ণনা দাও এবং কোন মাটিতে কি ফসলের চাষ ভাল হয় তা উল্লেখ কর। শারীরবৃত্তীয় ভাবে শুষ্ক মৃত্তিকা বলিতে কি বোঝ? বোদ্ কি? কি ভাবে বোদ্ গঠিত হয়?

7. ব্যাকটেরিয়ার গঠন, আকৃতি ও জনন প্রক্রিয়া এবং উপকারী ও অপকারী ভূমিকা আলোচনা কর। ভাইরাস কাকে বলে? ভাইরাসকে জীব ও জড়ের মধ্যবর্তী বলা হয় কেন? কয়েকটি ভাইরাসঘটিত রোগের নাম কর। দুটি উপকারী ও দুটি অপকারী ছত্রাকের নাম লেখ। দুটি অপকারী প্রোটোজোয়ার নাম লিখ। ব্যাকটেরিওফাজ কি? পাস্তুরাইজেশন কাকে বলে?

8. স্নায়ুতন্ত্র কাকে বলে? স্নায়ুতন্ত্রের একক কি? সাইন্যাপস্ কি? চিত্রসহ মানুষের মস্তিষ্কের গঠন ও প্রতিটি অংশের কাজ উল্লেখ কর। চিত্রসহ মানুষের চোখের অন্তর্গঠনের বর্ণনা দাও ও প্রতিটি অংশের কাজ উল্লেখ কর।

9. কৃষিকার্যে হরমোনের ব্যবহারিক প্রয়োগ উল্লেখ কর। হরমোন ও উৎসেচকের মধ্যে পার্থক্য কি? স্থানীয় হরমোনের উদাহরণ দাও। জরুরীকালিন হরমোন কাকে বলে ও কেন? পার্থেনোকার্পি কি?

10. কোষ বিভাজন কাকে বলে? কয় প্রকার ও কি কি? মাইটোসিসকে সমবিভাজন ও মায়োসিসকে হ্রাস বিভাজন বলা হয় কেন? চিত্রসহ মাইটোসিস কোষ বিভাজনের বর্ণনা দাও। মাইটোসিস ও মায়োসিস কোষ বিভাজনের তাৎপর্য কি? মাইটোসিস ও মায়োসিসের মধ্যে পার্থক্য কি?

11. (a) বৃদ্ধি কাকে বলে? উদ্ভিদ বৃদ্ধি ও প্রাণী বৃদ্ধির মধ্যে কি কি পার্থক্য দেখা যায়? মুখ্য বৃদ্ধিকাল কাহাকে বলে? বার্ষিক বলয় কি? উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় সর্তাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(b) চিত্রসহ সপুষ্পক উদ্ভিদের যৌন জনন পদ্ধতি বর্ণনা কর। দ্বি-নিষেক কি? চিত্রসহ ব্যাঙের যৌণ জনন পদ্ধতি বর্ণনা কর। যৌন-জনন ও অযৌন-জননের মধ্যে পার্থক্য কি?

12. কৃষির উন্নতিতে সংকরায়ণ পদ্ধতির ভূমিকা আলোচনা কর।

13. জীব অভিব্যক্তি বলতে কি বোঝ? জীবনের উৎপত্তি কি ভাবে হয়? লুপ্ত প্রায় অঙ্গ বলতে কি বোঝ? সমসংস্থ ও সমবৃত্তি অঙ্গের মধ্যে পার্থক্য কি? অভিব্যক্তির স্বপক্ষে তিনটি প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনা কর। দুটি সংযোগকারী প্রাণীর নাম কর।

14. অভিযোজন কাহাকে বলে? অভিযোজনের উদ্দেশ্য কি? নিম্নলিখিত উদ্ভিদ ও প্রাণীগুলির বিশেষ অভিযোজন উল্লেখ কর: (a) সুন্দরী গাছ (b) পদ্ম (c) মটর গাছ (d) পায়রা (e) রুই।

15. ইকোসিসটেম কাহাকে বলে? ইকোসিসটেমের উপাদানগুলি কি কি? খাদ্য-খাদক ও বিয়োজক বলিতে কি বোঝ? ইকোসিসটেমে উৎপাদক কাহারা? বায়োমাস ও বায়োস্কিয়ার বলতে কি বোঝ? বস্তু সংস্থানিক পিরামিড ও খাদ্য শৃঙ্খল কি? ইকোসিসটেমের মধ্যে শক্তিপ্রবাহ কি ভাবে ঘটে? একটি পুকুরের উদাহরণ দিয়া ইকোসিসটেম সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও।

16. চিত্র অঙ্কন করে প্রতিটি অংশ চিহ্নিত কর:

(a) একটি সম্পূর্ণ ফুল (b) একক পত্র ও যৌগিক পত্র (c) উদ্ভিদ কোষ ও প্রাণী কোষ (d) আরশোলার পৌষ্টিম তন্ত্র (e) ব্যাঙের পৌষ্টিক তন্ত্র (f) ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ (g) কর্ণের অন্তর্গঠন।

17. পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য দেখাও:

(i) সালোক সংশ্লেষ ও শ্বাসকার্য (ii) হলোজোয়িক ও হলোফাইটিক (iii) পরিপাক ও আত্তীকরণ (iv) পরজীবী ও মৃতজীবী (v) উপচিতি ও অপচিতি (vi) জাইলেম ও ফ্লোয়েম (vii) রক্ত ও লসিকা (viii) সিস্টোল ও ডায়াস্টোল (ix) শিরা ও ধমনী (x) ট্রপিক চলন ও ন্যাস্টিক চলন (xi) ম্যালপিজিয়ান নালী ও ম্যালপিজিয়ান করপাসল (xii) ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস (xiii) কর্নিয়া ও কক্লিয়া (xiv) ইনসুলিন ও অ্যাড্রিনালিন (xv) জিব্বারেলিন ও কাইনিন (xvi) সাইটোকাইনেসিস ও ক্যারি-কাইনেসিস (xvii) হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড (xix) নিষেক ও সংশ্লেষ (xx) পার্থেনোজেনেসিস ও পার্থেনোকার্পি (xxi) উৎপাদক জীব ও খাদক জীব।

18. টীকা লিখ:

(i) গ্লাইকোলিসিস (ii) অতিরিক্ত শ্বাসগন্ত্র (iii) মিথোজীবীত্ব (iv) ভিটামিন (v) B. M. R. (vi) ভেনাস হৃৎপিণ্ড (vii) প্রতিবর্ত ক্রিয়া (viii) অক্সিন (ix) জীবাশ্ম (v) সংকরায়ণ (xi) সেন্ট্রোমিয়ার (xii) জোড় কলম (viii) কোরকোদগম (xiv) প্রকারণ (xv) অন্তর্বর্তী প্রাণী (xvi) অভয়ারণ্য (xvii) অক্সিজেন আবর্ত।

19. নিম্নলিখিত বিজ্ঞানীগন কি কারনে বিখ্যাত:

(a) উইলিয়াম হার্ভে (b) ল্যাণ্ডস্টিনার (c) কুন (d) ফাঙ্ক (e) লিউয়েন হুক (f) আয়ানোস্কি (g) আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং (h) রবার্ট হুক (i) প্যাভলভ (j) ট্যান্সলো (k) মেণ্ডেল (l) লুইপাস্তুর (m) ল্যামার্ক (n) ডারউইন (o) ডি-ভ্রীস।

বুলচন্দ্রপুর, পাঁইটা, বর্ধমান।

মাইক্রোস্কোপ

নির্মলকান্তি ঘোষ

একটি বালক। কতই বা তার বয়স! তবু সে আচার-ব্যবহারে বিনয়ী। সহপাঠীদের সঙ্গে পর্যন্ত ঝগড়া করে না। তার এই স্বভাবের জন্যে হেড স্যার এবং গুরুজনদের কাছে সে প্রিয় পাত্র।

এই মিষ্টি স্বভাবের, ছেলেটির নাম ফ্রিস্ট জানিক। সে ভারি বুদ্ধিমান এবং পড়ে আমস্টারডাম শহরের একটা স্কুলে।

ছেলেবেলা থেকেই ছোটদের একটা বিশেষ কিছুর দিকে ঝোঁক থাকে। যেমন কেউ বা খেলাধুলো ভালোবাসে, কেউ বা পড়াশুনো, আবার কারুর অন্য কিছুতে। কিন্তু জানিকের সবিশেষ আগ্রহ ছিল অজানাকে জানার। এ ব্যাপারে তার অদম্য কৌতূহল দেখা যেত।

মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের পিছনে জানিকের যে নেপথ্য কাহিনী রয়েছে, সে প্রসঙ্গে কিছুটা আলোচনা করা যাক। তখন জানিকের খুবই বয়স কম। সে বয়সের ছেলেরা খেলনা, পুতুল ইত্যাদি পেলে আর কিছুই চায় না। ওতেই ওদের মন কানায় কানায় ভরে ওঠে। কিন্তু এদের মধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রম ছিল জানিক।

এরপর হঠাৎই ঘটনাটা ঘটে গেল। একদিন জানিক স্কুলে যাচ্ছিল। তার সামনে দিয়ে একজন ফেরিওয়ালা যাচ্ছে। তার সঙ্গে রয়েছে পেতলের তৈরী খেলনা দূরবীন।

বালক জানিক একটা দূরবীন চেয়ে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে। দূরের জিনিস একেবারে তার চোখের সামনে এসে ধরা দিচ্ছে। ভাবে—বাঃ, ভারি সুন্দর জিনিস তো! সঙ্গে সঙ্গে তার কৌতূহলী মন এটা কেনবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। আর তার পকেটে পয়সাও ছিল। তবে সে পয়সা বাড়তি পয়সা নয়। তার বাবা তাকে টিফিন খেতে দিয়েছে। সে ভাবে, একদিন টিফিন না খেলে কিছু হবে না। টিফিন তো সে রোজই খায়। আর একদিনের টিফিনের পয়সা দিয়ে যদি ঐ মজার খেলনাটা পাওয়া যায় মন্দ কী! এবং এ ব্যাপারে তার অনুসন্ধানী মন তাকে প্রেরণা যোগায়। তারপর যা ভাবা সেই মত কাজ করে সে দূরবীনটা কিনে বাড়ি ফিরলো।

অন্যদিন বাড়ি ফিরে জানিক খানিকটা খেলাধুলোর

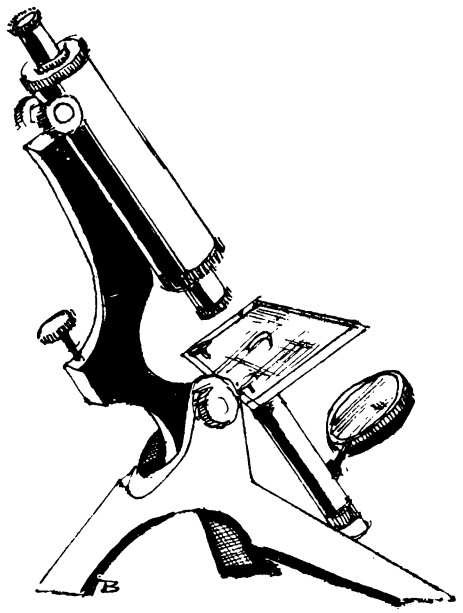

পর কিছুটা সময় খাওয়ার টেবিলে কাটিয়ে তারপর পড়াশুনো শুরু করে দেয়। কিন্তু আজ সে কিছুতেই পড়াশুনোয় মন বসাতে পারছে না। দূরবীনটা নিয়েই সে মেতে রইলো।

জানিক শুধু দূরবীন চোখে দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছে না। কারণ তার যে দেখার মতো চোখ রয়েছে। এবং যতই দেখছে ততই সে রোমাঞ্চ বোধ করছে, যা বলে অন্যকে কিছুতেই বোঝানো যায় না। তার কৌতূহলী মন শুধু বলে চলেছে, এর মধ্যে কী রয়েছে, যাতে দূরের জিনিস এক নিমেষে একেবারে কাছে চলে আসছে। সে ঠিক করে ফেললো, হ্যাঁ, এটা খুলে দেখতেই হবে। নইলে সে যেন কিছুতেই স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছে না। তার হাত দুটো দারুণভাবে নিসপিস করতে থাকে।

মন যখন সঠিক পথের নির্দেশ দিয়েছে এবং যাতে নিজের পুরোমাত্রায় সায় আছে, তখন আর দেরি করা কখনো উচিত নয়। না করলে পরে পস্তাতে হবে। তারপর জানিক কাঁপা হাতে দূরবীনটা খুলে ফেলে।

দূরবীন খুলেই জানিকের বিস্ময়ের পালা। ভাবতেই পারেনি যে ভেতরে শুধু এই আছে। সে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। সে দেখতে পায়, ভেতরে রয়েছে মাত্র দু'খানা গোল গোল কাচের চাকতি। তবে এ কথা ঠিক, ঐ কাচগুলোর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস, এ ধরনের কাচ পেলে সে অনায়াসে একটা এরকম দূরবীন তৈরি করতে পারবে। কিন্তু সামান্য কাচ হলেও

এরকম কাচ কোথায় পাওয়া যায়, তা তার জানা নেই। আর কাকেই বা জিজ্ঞেস করবে! মোটা মোটা দুটো কাচের টুকরো যোগাড় করে ঘষে ঘষে দূরবীনের কাচের মত করতে চেষ্টা করলো, কিন্তু বিধি বাম, হলো না। তবে লেন্স এবং আলোর সম্বন্ধে অনেক কিছু জানবার কথা তখনই তার মাথায় এলো। আর সে মনে মনে ঠিক করে নেয়, বড় হয়ে এ সম্বন্ধে সে গবেষণা করবে।

ইতিমধ্যে কয়েক বছর পার হয়ে গেছে। জার্মানিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিদ্যায় সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করলেও ছোটবেলাকার দূরবীন তৈরির কথা ভুলতে পারেননি। একদিন শুরু করে দিলেন লেন্স এবং আলোককে নিয়ে গবেষণা। সে কী আমানুষিক পরিশ্রম, যার একমাত্র নজির তিনিই।

এবার ভগবান জার্মানিকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারলেন না। তিনি তৈরি করলেন উত্তল, অবতল ইত্যাদি কত ধরনের লেন্স! তবু পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ নেই। চললো রাত-দিন। দিনে তিন চার ঘণ্টা ঘুমোতেন কী না সন্দেহ! এর ফলস্বরূপ একদিন তৈরী করতে সক্ষম হলেন এক অদ্ভূত ধরনের অনুবীক্ষণ যন্ত্র যার কার্যকারী ক্ষমতা সাধারণ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের চাইতে ঢের বেশি। এই বিশেষ ধরনের অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নাম রাখা হলো—ফেজ কনট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপ।

ফেজ কনট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপ এ যুগে সকল রকম সূক্ষ্ম গবেষণার অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে জীবন্ত তন্তুর ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করা ও জীবনের মূল রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে নানা পরীক্ষা করা। এরই জন্যে আজকের জীবন-বিজ্ঞান এত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

জার্মানিকের এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্যে তাঁকে 1953 সালে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

সত্যি, ভাবতে কতই না অবাক লাগে যে, একজন ফেরিওয়ালার কাছে একটা সাধারণ দূরবীন দেখে জার্মানিক প্রেরণা পেয়ে যাবেন এমন এক অসাধারণ দূরবীন তৈরীর ব্যাপারে। আসলে মানুষ তো আমরা সবাই। কিন্তু ক'জন মানুষের মতো মানুষ আমরা! তেমনি ভগবান আমাদের চোখও দিয়েছেন, কিন্তু দেখার মতো চোখ ক'জনের আছে! আবার কোন কিছু দেখে অনেকে চোখ উল্টে থাকতে পারে না। তার ভেতরের উত্তেজনাই তাকে এ কাজে উৎসাহ জোগায়। এ সবের মিলিত গুণের সমন্বয় ঘটেছে জার্মানিকের মধ্যে। সেই সঙ্গে তিনি আর একটা কথা ভাবতেন, মানুষ উচ্চাকাঙ্খা এবং অধ্যবসায় ছাড়া বড় হতে পারে না। তাই বাঁচলে সিংহের মতনই বেঁচে থাকা শ্রেয়।

128/2, হাজরারোড, কলি-26

প্রবাল

বিবেক রায়

সুমনের বাবা নানান্ কারণে ছেলের জন্যে চিন্তিত হ'য়ে অগত্যা এক হস্তরেখাবিদ্ এর কাছে গেলেন। সুমনের হাতের রেখা দেখে হস্তরেখাবিদ্ বললেন, 'ওকে প্রবাল অর্থাৎ পলা ধারণ করতে হবে। রূপোর আংটিতে পাঁচ রতি পলা বসিয়ে ডান হাতের একটি আঙ্গুলে পরতে হবে। তাহলেই সুমনের বিপদ আপদ কেটে যাবে।'

সুমনের বাবা হস্তরেখাবিদের প্রেসক্রিপসন অনুযায়ী ছেলের মঙ্গলের জন্যে সেই ব্যবস্থাই করলেন। আংটিটি সুমনের খুবই পছন্দ হলো। কিন্তু 'প্রবাল' জিনিসটা যে কি, সুমন তা জানতো না বলে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'এটা লাল পাথর, না অন্য কিছু?'

সুমনের বাবা পণ্ডিত মানুষ। অনেক লেখাপড়া করেছেন। ছেলেকে তাই বললেন, 'শোন, তবে প্রবালের কথা।—তুমি হয়তো জান, সাগরের সব জায়গার গভীরতা সমান নয়, উষ্ণতাও সমান নয়। সাগরের যে অঞ্চলের জল অপেক্ষাকৃত নির্মল, একশো থেকে দেড়শো ফুটের বেশি গভীর নয় এবং জলের উষ্ণতা ষাট ডিগ্রী ফারেন-

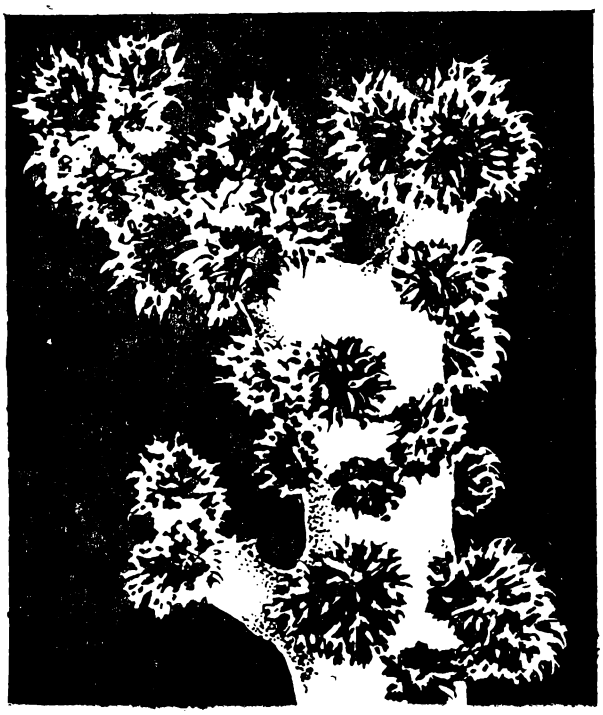

হাইটের কম নয়, সে অঞ্চলে বাস ক'রে এক জাতীয় কীট। নাম প্রবাল।

প্রবাল কীট অতি ক্ষুদ্র। এক একটি ক্ষুদে প্রবাল কীটের দেহের ব্যাস মাত্র এক মিলিমিটার! নগণ্য অমেরুদণ্ডী প্রাণি হ'লেও এরা কিন্তু বিচিত্রবর্ণশোভিত অপূর্ব সৌন্দর্যের আধার। এদের দেহ দুই স্তর কোষের দ্বারা গড়া। এরা একটিমাত্র নালী পথের দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করে এবং দেহের অসার পদার্থ বর্জন করে।

প্রবালের জন্ম হয় ডিম থেকে। ডিম থেকে আলপিনের মাথার মত খুব ছোট ছোট শূককীট জন্মায়। শূককীট হতে পূর্ণাঙ্গ প্রবালের রূপ পেতে সময় লাগে প্রায় চার হপ্তা।

প্রবালের শূককীটেরা শৈশবে জলে সাঁতার কেটে বেড়ায়। কিছুকাল পরে কোন সামুদ্রিক শিলা বা কোন মরা প্রবালের দেহের ওপর আশ্রয় নেয়। আশ্রয় নিয়ে স্থির হয়ে ওরা সেখানে উদ্ভিদের মত জীবন যাপন করে। তখন চলাফেরা করার ক্ষমতা থাকে না। তারপর একটু বড় হ'লে ওদের মুখের কাছে কয়েকটি প্রত্যঙ্গ বেরোয়। সেই প্রত্যঙ্গগুলিকে বলা হয় 'ফিলার'। ফিলারের সাহায্যে প্রবাল কীট তখন জলে ভাসমান অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামুদ্রিক কীট ধরে খায়। পূর্ণাঙ্গ প্রবাল কীট হুলবিশিষ্ট শুঁড়ের সাহায্যে শিকার ধরে। ওদের শিকারের মধ্যেও বেশ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। দিনের বেলায় ওরা কিছু খায় না। খাবার খায় কেবল রাত্রে।

বেলা গঠনকারী প্রবাল কীটেদের দেহে এক প্রকার এককোষী উদ্ভিদ (অ্যালগি) বাস করে। এই এককোষী উদ্ভিদেরা অঙ্গার আত্তীকরণ প্রক্রিয়ায় প্রবাল কীটকে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন দান ক'রে তাদের দেহের পুষ্টি ও বংশ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বিনিময়ে তারা প্রবালের দেহ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রেট ও ফসফেট গ্রহণ করে।

পূর্ণাঙ্গ প্রবাল কীটের দেহ থেকে সাদা রঙের রস ক্ষরিত হয়। ঐ রস তার নরম দেহকে ঘিরে এক রকম শক্ত খোল তৈরি করে। ঐ খোলটি খড়িমাটি অর্থাৎ ক্যালসিয়াম কার্বনেটের আস্তরণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। চুন জাতীয় পদার্থের এই আস্তরণ নলের আকারে উপর ও পাশের দিকে ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে শাখা-প্রশাখা সমন্বিত হরিণের শিং এর আকার ধারণ করে। কোন কোন প্রবাল কীট লতাগুল্ম বা উদ্ভিদের মত কিংবা ফুলদানীর মত দেখতে হয়। কোন কোনটি আবার পোকা মাকড়ের আকৃতি বিশিষ্ট হয়। এক মিলিমিটার ব্যাসযুক্ত একটি প্রবাল কীটের দেহের চারদিকে চুন জাতীয় পদার্থ সঞ্চিত হবার তিন বছর পর তার ওজন দাঁড়ায় প্রায় সাতশো গ্রাম।

প্রবাল কীটেরা সামাজিক প্রাণি। এরা দল বেঁধে এক সঙ্গে বাস করে। তবে হ্যাঁ, দু' এক জাতের প্রবাল কীট আছে, যারা একাকী বসবাস করে। ওরা মরে গেলে ওদের দেহের নলকার খড়িমাটির আস্তরণ গুঁড়িয়ে গিয়ে স্তরে স্তরে জমে প্রবাল দ্বীপের উৎপত্তি হয়। প্রবাল কীট বাতাসে বাঁচে না, তাই প্রবাল স্তূপও কখনও জলের ওপরে ওঠে না। জলের মধ্যেকার প্রবাল স্তূপের ওপরে সাগরের স্রোতে বয়ে আসা মাটি, বালি, শঙ্খ, ঝিনুক, শামুক প্রভৃতি স্তরে স্তরে জমতে থাকে। জলের ওপরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে প্রবাল স্তূপ প্রবাল দ্বীপের আকৃতি লাভ করে। সামুদ্রিক পাখিরা তার ওপর বসে। নানা রকম বৃক্ষ লতার বীজ এনে ফেলে। কালক্রমে সে জায়গাটি উদ্ভিদ ও প্রাণিদের বসবাসের উপযোগী দ্বীপে পরিণত হয়।—এরই নাম প্রবাল দ্বীপ।

ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রবালের বাসভূমি। ভারত মহাসাগরে লাক্ষা দ্বীপ, মাল দ্বীপ এবং প্রশান্ত মহাসাগরের বহু দ্বীপই প্রবাল কীটের দেহাবশেষ দিয়ে গড়া।

সাগরে প্রবাল দ্বীপের মত প্রবাল প্রাচীরও আছে। অষ্ট্রেলিয়ার 'গ্রেট বেরিয়ার রিফ' নামক প্রবাল প্রাচীরটি তো জগদ্বিখ্যাত।

প্রবাল যখন ডিম কিংবা শূককীট অবস্থায় থাকে, তখনই তাদের বড় বিপদের সময়। ঐ সময় সাগরের প্রাণি, যেমন সামুদ্রিক কাঁকড়া, প্রোটোজোয়া, শামুক, তারা-মাছ ইত্যাদি এদের গিলে খায়। পূর্ণাঙ্গ প্রবাল কীটেদেরও খেতে ছাড়ে না। তা হোক্, প্রবাল কীটও জন্মে কোটি কোটি। তার থেকে লাক্ষ লাক্ষ কীট অন্যান্য প্রাণির পেটে গেলেও প্রবালের সংসার বা সমাজে তার প্রভাব বড় একটা পড়ে না। প্রবাল দ্বীপ গড়ে ওঠার জন্যে প্রবাল কীটের অভাব ঘটে না।

এন. বি. টি.—99এ, ইন্দা, খড়্গপুর

পৃথিবীর যদি বলয় থাকত ?

হীরক দাশ

নটি গ্রহ নিয়ে সূর্যের এই বিরাট সৌর পরিবার অর্থাৎ সৌর জগত সম্পর্কে তোমাদের নিশ্চই অল্প বিস্তর ধারণা আছে। দ্বিতীয় বৃহতম গ্রহ শনির চারপাশে যে বলয় বা ring আছে তাও তোমরা জানো। ইদানিং আবার সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতি এবং ইউরেনাস গ্রহেরও বলয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। এরকম একের পর এক গ্রহের চারপাশে বলয়ের অস্তিত্ব প্রমাণ পাওয়া যেতে থাকলে বিজ্ঞানীদের মনে সন্দেহ জাগলো। কোন কালে পৃথিবীতে এরকম বলয় ছিল কিনা, আর বর্তমানে যদি থাকতো তাহলে পৃথিবীর অবস্থাটা কি দাঁড়াতো ? খুবই আশ্চর্য জনক ব্যাপার সন্দেহ নেই। ব্যাস্, জ্যোতি বিজ্ঞানীরা উঠে পড়ে লেগে গেলেন এবং এই ব্যাপারে জোর গবেষণা চালালেন।

তারপর এক সময় সত্যি সত্যি দেখা গেল যে এই গ্রহের চার পাশে ঘিরে ছিল এক প্রকাণ্ড বলয়। ব্যাপারটা প্রথম প্রমাণ করলেন মার্কিন বিজ্ঞানী জন ও'কেফি। বর্তমানে এর কোন অস্তিত্ব নেই এবং এই পার্থিব বলয়ের উদ্ভব হয়েছিল আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন কোটি বছর আগে! কিন্তু সেই তুলনায় ওই বলয় বেশি 'দিন' টিকে থাকতে পারেনি—মাত্র কয়েক লক্ষ বছর ধরে রাজত্ব চালিয়েছিল পৃথিবীর নীল আকাশে।

ওই অস্থায়ী বলয়ের রাজত্বকালে পৃথিবীতে মানুষের জন্ম হয় নি। ছিল শুধু অন্যান্য প্রাণী এবং গাছপালা। কিন্তু সে সময় প্রকৃতিতে শুরু হলো ওলটপালট—দেখা দিল নানান বিপর্যয়। বনের গাছপালার সংখ্যা হঠাৎ হ্রাস পেতে লাগলো, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল বেশ কয়েক প্রজাতির জীবজন্তু। দিনের তাপমাত্রা নেমে আসল প্রায় 18-20 ডিগ্রি সেলসিয়াসে। শীত বা গ্রীষ্মে এর হেরফের হল না মোটেই অর্থাৎ শীতকালে যে ঠাণ্ডা গ্রীষ্মকালেও প্রায় সে রকম ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করলো। কি অদ্ভুত ব্যাপার ভাবো তো ? প্রাকৃতিক পরিবেশে এসব বিপর্যয় ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন কোটি বছর আগে। এবং এসবের মূলে ছিল ওই পার্থিব বলয়। কিন্তু ওই বলয়ের সৃষ্টি হলো কিভাবে ? ও'কেফি, প্রমুখ বিজ্ঞানীদের মতে, বাঁহরবিশ্ব থেকে আগত টেক্‌টাইটস্-এর মেঘপুঞ্জ সেসময় প্রচুর পরিমাণে ধরা পড়েছিল পৃথিবীর আকর্ষণে এবং জমতে আরম্ভ করেছিল পৃথিবীর চারপাশে এক নির্দিষ্ট কক্ষপথে। ব্যাস্, এভাবে আস্তে আস্তে তৈরি হয়ে যায় এই টেক্‌টাইটস্-এর বলয়। যার অবস্থান ছিল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অনেক উপরে এবং কয়েক লক্ষ বছর ধরে ছড়িয়ে ছিল ওই কক্ষপথে।

তোমরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই ভাবছো যে এই টেক্‌টাইটস্ আবার কি জিনিস ? টেক্‌টাইটস্ হলো কাঁচের মতো ও নিঃশ্ছিদ্র এক পদার্থ, যার সন্ধান পাওয়া যায় পৃথিবীর নানান স্থানে। কিন্তু এর রাসায়নিক সংমিশ্রণের সাথে

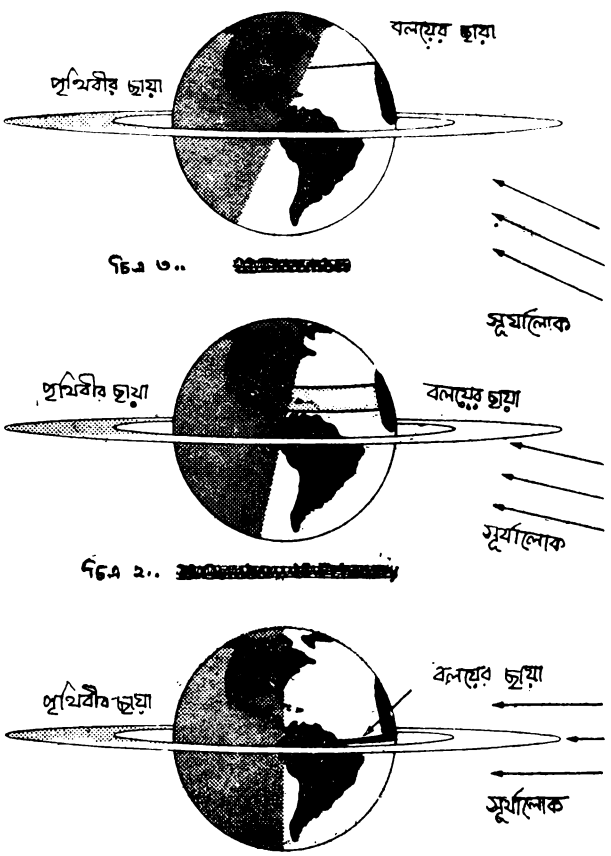

এর প্রাপ্তিস্থানের ভূ-গঠনের কোন বিশেষ মিল নেই—যেন একটু খাপছাড়া পদার্থ। সেইজন্য উল্কার মতো এদের উৎস ধরা হয়েছে বহির্বিশ্ব। এবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। কয়েক লক্ষ বছর পর ওই পার্থিব বলয়ে ভাঙন ধরার ফলে টেক্‌টাইটস্‌-এর মেঘ নেমে এলো পৃথিবীর বুকে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় উত্তর আমেরিকান টেক্‌টাইটস্‌ ক্ষেত্র থেকে, যার ব্যাপ্তি ক্যারেবিয়ান সাগর থেকে সোজা প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য বরাবর। এবং ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে, এই বিরাট ক্ষেত্রের জন্ম ওই বলয় সৃষ্টির কিছু কাল পরেই। ওই বলয় পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের 10 থেকে 15 হাজার কিলোমিটার উপরে প্রায় 10 থেকে 16 কোটি বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে বসে ছিল। আর সমগ্র বলয়টার ওজন কতো ছিল জানো ? আড়াই হাজার কোটি টন! এই বিশাল বলয়টির ভাঙন ধরলো কিভাবে তার সঠিক উত্তর বিজ্ঞানীদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে এইটুকু জানা গেছে যে মাত্র 12 ঘণ্টার মধ্যে ওই সম্পূর্ণ বলয় নাকি পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছিল। যাক, এবার আসল প্রসঙ্গে আসি। আচ্ছা, বলয়টা যদি আজও পৃথিবীকে বেষ্টন করে থাকতো তবে কি অবস্থা হতো ? নিশ্চয়ই ভাববার বিষয়। তবে সুখের বিষয় আমাদের ভাবনার আগেই বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে ভেবে ফেলে মতামতও দিয়ে ফেলেছেন। সহজেই আন্দাজ করতে পারছো যে তখন আবহাওয়ায় বিরাট হেরফের দেখা দিতো। ঋতুর কিছু অংশে ওলটপালট ঘটতো এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা হ্রাস পেতো কারণ সূর্যের আলো বহুলাংশে পৃথিবীর বুকে আসতে বাধা দিতো ওই বলয়। ঠিক যা ঘটেছিল সাড়ে তিন কোটি বছর আগে। কিন্তু এসবের চাইতেও মজার ব্যাপার ঘটতো পৃথিবীর বুকে রৌদ্র-ছায়া খেলা নিয়ে। প্রায় বিষুবরেখার উপর বরাবর অবস্থিত বলয়টি গ্রীষ্মকালে পৃথিবীর মাঝামাঝি একটানা লম্বা ছায়া প্রদান করতো। অর্থাৎ বিষুবরেখা কাছাকাছি অবস্থিত দেশগুলোতে তখন দিনের বেলায় সূর্যের আলো এসে পৌঁছুতো না। আফ্রিকার মধ্য অংশ, ব্রাজিল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ এই অংশে পড়ে। 1 নং ছবি দেখ। তারপর ওই ছায়া আস্তে আস্তে প্রশস্ত হতে এবং পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের দিকে উঠতে আরম্ভ করতো। শরৎকালে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে এবং আবার বসন্তকালে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে বেশ কয়েক দিন ধরে সূর্যগ্রহণ শুরু হতো কর্কট ক্রান্তির আশেপাশে অবস্থিত দেশগুলোতে। মধ্য আমেরিকা, উত্তর আফ্রিকা, আরব দেশগুলো, ভারত, ইন্দোচীন এবং জাপানের লোকরা দিনের বেলা সরাসরি সূর্যের আলো থেকে বঞ্চিত হতো। সেসব দেশে তখন বেশ কিছু দিন ধরে থাকতো কেবল সন্ধ্যে এবং রাত্রি (চিত্র ২)। বিরাট মুশকিল হতো শীতকালে। তখন ইউরোপ, রাশিয়া এবং উত্তর আমেরিকায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, বরফ আর সেই সাথে সূর্যও বলয়ের পেছনে ঢুকে পড়তো। কি অবস্থাটা হতো ভাবো তো। এমনি শীতকাল তার উপর আবার সূর্যের দেখা নেই। কারণ বলয়ের ছায়াটা তখন পৃথিবীর একেবারে উত্তর প্রান্তে গিয়ে পড়তো। সেসময় অবশ্য এশিয়া, মধ্য আমেরিকা এবং উত্তর আফ্রিকার লোকরা শীতের প্রকোপ থেকে বেঁচে যেতো। কিন্তু সূর্য বিহীন শীতকালে উত্তর অংশের লোকদের হাড় পর্যন্ত ঠাণ্ডায় কাঁপতে আরম্ভ করতো (চিত্র ৩)।

এছাড়া অন্য সময়, ধরো ভারতে গ্রীষ্ম এবং শীতকালে সূর্যের সঙ্গে আকাশের একপাশে উজ্জ্বল ওই বলয় দেখা যেত। আর রাত্রে আমরা হয়তো পৌঁছে যেতাম অন্য আর এক জগতে। আকাশে চাঁদের সাথে সাথে ওই বলয় এক চকচকে রূপ ধারণ করতো। কি অদ্ভুত সুন্দরই না দেখতে হতো সেই দৃশ্য!

বৈষ্ণবঘাটা, কলকাতা-84

বিজ্ঞান-সংবাদ

10 ডিসেম্বর, 1983 দ্যা সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের উদ্যোগে বসিরহাট কলেজে 'মানুষ ও পরিবেশ' শীর্ষক একটি আলোচনা হয়।

সভার সঙ্গে বসিরহাট বিজ্ঞান সংস্থার পক্ষ থেকে একটি চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

মনোজ্ঞ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ডঃ তারক মোহন দাস, বিধান সভার সদস্য অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ নন্দ ও শুভব্রত রায়চৌধুরী।

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

সুধাংশু পাত্র

সে রাতটা ছিল আমার কাছে বড় ভয়ঙ্কর রাত। আমার ছোট মেয়ে কলির বন্ধু এক সাঁওতাল মেয়ে সন্ধ্যার কিছু পরেই কলেরা রাক্ষসীর শিকার হয়েছে। আমারই চোখের সামনে তার কচি ও কোমল দেহটাকে বেঁধে ছেঁদে সাঁওতালরা নিয়ে গেছে খালের পাড়ে। হয়ত জোয়ারের জলে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছে অথবা ধরণীর নিতান্ত অবোধ এই শিশুকন্যাটিকে লুকিয়ে রেখে এসেছে ধরণীরই বক্ষ পঞ্জরের তলদেশে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। গাছপালায় ঘেরা সরু গ্রাম্য গলি পথে চিরান্ধকারে যাত্রার ব্যথা বুকে বহন করে টলতে টলতে কোন রকমে বাড়ী ফিরে এসেছিলাম। তার অনেক আগেই কলি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিল আমার বিছানায়। বুকের এত অনল জ্বালা সত্ত্বেও পেটের অনল নির্বাপিত হয়নি। বাধ্য হয়ে স্বার্থপর দেহের চাহিদা মিটিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়েছিলাম কলিরই পাশে। ঘুমও এসে গেছিল কখন।

ঘুম ভেঙ্গে গেল কলির চিৎকারে। শিয়রের কাছে রাখা ম্লান হ্যারিকেনের শিখাটাকে একটু বাড়িয়ে দিয়ে তাকে বুকের কাছে টেনে নিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে রে মা তোর?

ভয়ে কাঁপছিল কলি। কোন কথাই বলতে পারল না। কেবল অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো এদিকে ওদিকে। বুঝতে পারলাম, প্রকৃতিস্থ নয় সে। তার মাথায় মৃদু করাঘাত করে ভয় ভাঙ্গাতে চেষ্টা করলাম। বললাম—তুই তো আমার কাছে শুয়ে আছিস কলি? ভয় কি?

অনেকক্ষণ পরে কলি স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। ডাকলাম—কলি, কলি!

ডাক শুনলো কলি—উঁ!

—চিৎকার করে উঠলি কেন রে?

ঢোঁক গিলে বেশ কিছুক্ষণ সে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। এক সময় বললো—বাবা, চুনি এসেছিল আমার কাছে। হাত পেতে ওষুধ চাইছিল। আর ঠিক তক্ষুণি দুটো বড় বড় রাক্কস এসে তাকে ঘিরে ফেললো। রাক্কসগুলোর এই এত বড় বড় দাঁত, চোখগুলো টকটকে লাল, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল!

আমি হাসতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু মুখে আমার হাসি ফুটল না। বললাম—সন্ধ্যার সময় তুই এই সব কথা চিন্তা করেছিলি। তাইতো এমন স্বপ্ন দেখেছিস।

কি যেন ভাবলো কলি। বললো—না বাবা, সত্যি সে এসেছিল।

স্বপ্নকে আমি অবচেতন মনের ফসল রূপেই গণ্য করে থাকি। পরলোকেও আমার বিশ্বাস নেই। তবু এই পরিবেশে চুনির কথা ভেবে মনটা হু হু করে উঠলো। মনটা আপনা হতেই যাত্রা করলো সেই অন্ধকার পরলোক তত্ত্বের দিকে। কিন্তু ভেবে কিছুই কুলকিনারা করতে পারলাম না।

বালিশের তলা থেকে হাত ঘড়িটা বার করে দেখলাম, ভোরের আর বিলম্ব নেই। মেয়েকে একটু অন্যমনস্ক করার জন্য দোর খুলে বেরিয়ে এলাম বারান্দায়।

পূবের আকাশটা ফর্সা হয়ে এসেছে। তার ললাটে জ্বল জ্বল করছে শুকতারা। বুটিদার নীল জাজিমটা

তখনও আকাশ জড়িয়ে রেখেছে সারা অঙ্গে। ভ্রমণ শেষে চালায় বাঁশের ফোঁকরগুলোর কাছে পতপত করে ঘুরছে চামচিকারা। হুতোমরা নিরাপদ আশ্রয়ে প্রবেশ করার পূর্বে তেঁতুলের ডালে ভর পেটে ভুক্ ভুক্ করে ঠেঁকুর তুলছিল। মেয়েকে কোলে করে বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম।

ভোরের প্রকৃতির অপরূপ রূপ দেখেও কলি কোন কথা বললো না। একেবারেই চুপ। অথচ এমনটি তাকে কোনদিনই থাকতে দেখিনি। ভোরের পাপিয়ার মত, দুপুরে বসন্ত বৌরির একটানা বকবক ধ্বনির মত, সন্ধ্যায় শিরীষের ডালে শালিকদের দীর্ঘস্থায়ী চেঁচামেচির মত ওর কথা আরম্ভ হলে কিছুতেই থামতে চায় না। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে সে একেবারে বুড়ি হয়ে গেছে। কিংবা বুনো এক বুলবুলের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে যেন।

বনফুলের একটা কুঁড়ি পাপড়ি মেলার আগে ঝরে যেতে দেখে মুক আমিও। অনেকক্ষণ কেটে গেল চুপচাপ। কলিই কথা বললো আগে। জিজ্ঞাসা করলো—তুকতাক আর ঝাড়ফুঁক না করে ওষুধ দিলে চুনিটা বেঁচে উঠতো. তাই না বাবা ?

আমি সংক্ষেপে বললাম—হয়ত বাঁচতো।

—তুমি তো গেছিলে। ডাক্তারকে কেন ডাকলে না ?

ক্ষীণ কণ্ঠে বল্লাম—খবর পেয়ে আমি যখন যাই, তখন প্রায় শেষ অবস্থা। তবু ডাক্তার এসেছিল। কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না।

কলি হয়ত কিছুটা স্বস্তি পেল কিন্তু আমি পেলাম না। যখন আমি যাই, তখনও যদি হাতের কাছে ডাক্তার পাওয়া যেত তাহলেও বাঁচতো চুনি। কিন্তু কোথায় ডাক্তার ? গাঁয়ের ছেলেরা পাশ করে আলোর আশায় ঘর বেঁধেছে শহরে। হেলথ সেণ্টারের দূরত্ব-আট দশ মাইল। কাঁচা, অপরিসর রাস্তা—যানবাহনের কোন সুবিধা নেই। সর্বপ্রকারে বঞ্চিত যন্ত্র ও বিদ্যুতের আশীর্বাদ থেকে। থাকার মধ্যে শিবরাত্রির সলতের মত আছে এক হাতুড়ে। সেও নগদ পয়সা হাতে না পেলে পা বাড়ায় না। হাতের কাছে কোন ওষুধও পাইনি। তাই বাধ্য হয়ে সেই বীভৎস মৃত্যু দৃশ্য আমাকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। বার বার মনে হয়েছে. বর্তমান দশকে কলেরায় মৃত্যু বোধ হয় এই প্রথম।

মেয়ে এক সময় জিজ্ঞাসা করলো—ওরা অসুখ বিসুখে ডাক্তার ডাকে না কেন বাবা ?

ম্লান হাসি হেসে আমি বললাম—ওরা ঠিক মত শিক্ষা-লাভ করতে পারেনি।

—তুমি তো মাষ্টার ওদের শিখিয়ে দাওনি কেন ?

কলির এই অত্যন্ত সহজ ও সরল উক্তিটি ছবির ফলার মত বিদ্ধ হল আমার বুকে। সত্যই তো, আমি কি করেছি চুনিদের জন্য ? চুনির বাবা মংলা মাঝি এবং আরও কয়েকটি সাঁওতাল পরিবার গাঁয়ে এসেছে পাঁচ বছরেরও আগে। গাঁয়ের শেষ প্রান্তে, আমার বাড়ী থেকে কিছুটা দূরে মজে যাওয়া একটা খাস পুকুর পাড়ে ঘর বেঁধেছে। ওরা দত্তদের নুনের কারখানায় কাজ করলেও মঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতেও ওদের ছেলে বৌরা কাজ করতে আসে। মুখে যাই বলিনা কেন, দূরত্বটা আজও মুছে ফেলতে পারিনি। সভ্যতার মুখোস এঁটে কেবল অনুকম্পা প্রদর্শন করি মাত্র। মনটা পড়ে আছে সেই মধ্য যুগে।

কলি পুনরায় কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিল। জিজ্ঞাসা করলো—ওঁরা অচ্ছুৎ, যা তা খায় আর নোংরা থাকে বলে পড়াতে নেই বুঝি ?

কলির প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করতে মনটা তৎক্ষণাৎ ছুটে গেল আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে সেই অন্ধকার দিনগুলোর পানে। হিসেব করে দেখলাম, মাত্র দু হাজার কিংবা আড়াই হাজার পুরুষ আগে ওদের সঙ্গে আমাদের কোন তফাৎ ছিল না। আমরাও সেকালে বনে বনে ঘুরেছি, তীর ধনুক ও পাথরের হাতিয়ার নিয়ে শিকার করেছি, অর্ধসেদ্ধ মাংস খেয়েছি, নারী পুরুষ নির্বিশেষে কটি দেশে জড়িয়েছি মাত্র একখানা করে গাছের বাকল। তখন কোন জাত ছিল না, কোন ধর্মও ছিল না।

কতদিন পরে আমরা অরণ্যকে ত্যাগ করলাম। কিন্তু ওরা মন থেকে অরণ্যকে মুছে ফেলতে পারল না। সেদিনের তথাকথিত সভ্য মানুষের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে সন্তর্পনে অরণ্যে বিচরণ করতে লাগল। খাদ্য সংগ্রহ ও শিকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখল জীবনযাত্রা। অপর দিকে স্বার্থান্ধ ও মোহান্ধ হয়ে উঠলাম আমরা। জোর করে সরিয়ে দিলাম তাদের। ভুলে যেতে চাইলাম, একই উৎস থেকে আমাদের উভয়ের উৎপত্তি।

ঠিক সেই সময় পাশের বাড়ী থেকে ভেসে এল সদ্যোজাত এক শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি। চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে অন্য খাতে প্রবাহিত হল। মনে হল, স্বয়ং বিশ্বপ্রকৃতি মানুষের এই ভুলটা ভাঙ্গিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করছেন না। মোহগ্রস্ত মানুষকে সতত স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য ঐ শিশুদেরই প্রেরণ করছেন আমাদের কাছে। একতাল মাংসপিণ্ডরূপে প্রথমেই তারা বার্তা বহন করে আনছে, পৃথিবীর সমূহ জীব ও উদ্ভিদের সঙ্গে আছে

মানুষের একাত্মতা। হামাগুড়ি দেওয়া শিশু মানুষের পূর্ব-পুরুষ সেই বৃক্ষশাখা অবলম্বনকারী চতুষ্পদ বানরজাতীয় জীব যেন। বারবার আছাড় খাওয়া সত্ত্বেও শিশুর দাঁড়াবার অভ্যাস আদি মানবের দুপায়ে হাঁটার সুদীর্ঘ সাধনা। দাঁড়াবার পর থেকেই শিশুদের বুদ্ধি বৃত্তির প্রসার ঘটে। ঠিক যেমনটি ঘটেছিল আদি দ্বিপদী মানুষের বেলায়। সেদিন দাঁড়াতে গিয়েই সে পৃথক হয়ে পড়েছিল অন্যান্য প্রাণীদের কাছ থেকে। তখনই তার স্বরযন্ত্রের হয়েছিল উন্নতি। দৃষ্টিশক্তি বহুদূরে প্রসারিত হওয়ায় প্রসারিত হয়েছিল মগজের। তবু অরণ্যকে হঠাৎ তারা পরিত্যাগ করতে পারেনি। যেমন পারেনা ছোট ছোট মেয়েরা। কলিকেও দেখেছি। আট বছর বয়স হতে চললো তবুও টো টো করে গাছের তলায় ঘুরে বেড়ায়, ফড়িং প্রজাপতিদের পেছু নেয়, ফুলপাখী দেখলে আনন্দে করতালি দিয়ে উঠে এবং তর তর করে গাছে বেয়ে যায়। অনেকটা ঐ অরণ্যচারী মানুষদের মতই। হিসেব করে আরও দেখলাম, বড়দের মধ্যে স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যের ভেদ যতই থাকুক না কেন ছোটদের মধ্যে আদৌ নেই। তাই কত সহজে কলি ভাব করে নিয়েছিল সাঁওতাল মংলামাঝির মেয়ে চুনির সঙ্গে। কতবার তাকে ডেকে এনেছে বাড়ীতে, ছাগলছানার পেছনে দৌড়েছে, কাঠবেড়ালির পেছনে ধাওয়া করেছে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত মন দিয়ে বিচার করেছি, কলিকে ভৎর্সনা করেছি, বাধাও দিয়েছি। কিন্তু কলির মন একেবারে নির্বিকার ও মালিন্যহীন। গঙ্গার জলে ধোওয়া তুলসীপাতা যেন।

একের পর এক কত কথা মনের দুয়ারে আঘাত করে যাচ্ছিল আবার বিলীনও হয়ে যাচ্ছিল পর মুহূর্তে। কেবল বিবর্ণ দৃষ্টিটা সামনে ছিল পাতা। আর কলি উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল আকাশের পানে। হঠাৎ-বিস্ময়ভরা কণ্ঠে সে বলে উঠলো - দেখ, দেখ বাবা, ঐ চুনি তারা হয়ে ছুটে চলেছে আকাশের দিকে। তারা হওয়ার আগে সে ঠিক-এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে।

মেয়ের দৃষ্টিকে অনুসরণ করতে চোখে পড়ল, একটি তারা দক্ষিণ দিক থেকে ছুটে চলেছে ঈশান কোণের দিকে। নক্ষত্রের মত মিট মিট করছে না, স্থির তার আলো! বুঝতে পারলাম, বর্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের চিহ্নকে বুকে ধারণ করেছে মহাকাশ। ওর জন্ম বিশালায়তনের ঘন মেঘপুঞ্জ থেকে নয়, কিংবা গ্রহ উপগ্রহের মত সূর্যের বিচ্ছিন্ন অংশও নয়। পৃথিবীরই মানুষ ওকে নিজ হাতে গড়েছে এবং স্থাপন করেছে মহাকাশে। দূরত্ব বেশি হওয়ার জন্য পৃথিবীর আকর্ষণের টানে সহজে পৃথিবীর বুকে ছুটে আসতে পারছেনা। মহাকর্ষের নিয়ম অনুযায়ী চাঁদের মত অবিরত ঘুরতে হচ্ছে পৃথিবীর চারদিকে। তাই ওর নাম নকল চাঁদ বা কৃত্রিম উপগ্রহ।

মানুষের অনেক আশা। এদের মাধ্যমে পৃথিবী-পৃষ্ঠের এবং পৃথিবী সংলগ্ন বায়ু-স্তরের খবর সংগ্রহ করবে, টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে, দূরদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার ঘটাবে আমূল পরিবর্তন। এমনকি গ্রহ উপগ্রহের আবহাওয়াকে সংস্কার করে মনুষ্যবাসোপযোগী পরিবেশও গড়ে তুলবে। তখন নতুন স্বর্গ রচিত হবে পৃথিবীর বুকে। মনে এল অনন্ত জিজ্ঞাসা, সেদিন সত্যিই কি আমাদের মনটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে? রুদ্ধ হবে কি চুনিদের অকাল মৃত্যু? বুকের পাঁজর বিদীর্ণ করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

কলি এবং আমি উভয়ে তাকিয়েছিলাম সেই চলন্ত তারাটির দিকে। এক সময় মহাকাশের বুকে হারিয়ে গেল সেটি। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো কলি। জিজ্ঞাসা করলো—চুনি যে হারিয়ে গেল বাবা, এত তারার মাঝে আমি তাকে কেমন করে খুঁজে বার করবো? সে-কি আর আসবে না?

কলির ভুল ভাঙ্গাতে আমার প্রবৃত্তি হল না। বললাম —না, সে আর আসবে না কোনদিনই। জন্ম মাত্রই অসংখ্য তারার ভিড়ে হারিয়ে গেল।

কালিন্দী, মেদিনীপুর

বিজ্ঞানভিত্তিক ধারাবাহিক উপন্যাস

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সবুজ বনের গান

॥ আট ॥
ও কিসের আলো ?

চোখ খুলে কয়েক সেকেণ্ড কিছু বুঝতে পারলুম না। তারপর মনে হল, রুবি দ্বীপে আমাদের হোটেলেই শুয়ে আছি। কিন্তু এত আলো কেন? না—আলো নয়, রোদ। ঝলমল করছে উজ্জ্বল রোদ। আমার পিঠের নিচে বালি। মাথার ওপর ঝকঝকে নীল আকাশ। আমি এখানে শুয়ে আছি কেন?

সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। আমি কি স্বপ্ন দেখছি? নিশ্চয় একটা টানা অদ্ভুত ধরনের স্বপ্নের মধ্যে কাটাচ্ছি। বাঁদিকে নারকেল বন আর ঘন আগাছার জঙ্গল। ডানদিকে উঁচু বাঁধের মতো ন্যাড়া টিলা। সামনে ছোট্ট একটা হ্রদ। তারপর পেছনে তাকিয়ে প্রিয়বর্ধনকে দেখামাত্র আগাগোড়া সবটাই মনে পড়ে গেল।

প্রিয়বর্ধন একটা গাছের তলায় আগুন জেলে কী একটা করছিল। আমাকে উঠতে দেখে সে মুখ ফেরাল। তার মুখে কেমন একটা মিষ্টিমিষ্টি হাসি। 'হ্যাল্লো মিস্টার! শরীর ঠিক তো?'

জবাব দিলাম না। এই লোকটা আমার জঘন্য শত্রু। সে ক্যারিবুর স্তুনারে আমাকে খুন করতে চেয়েছিল। অথচ তারই সঙ্গে একই ভেলায় অথৈ সমুদ্রে আমাকে ভাসতে হয়েছিল। ভাগ্যের তামাসা আর কাকে বলে? আমি অবাক হয়ে তাকে দেখছিলুম। ভাবছিলুম, ইচ্ছে করলেই সে আমাকে সমুদ্রে ফেলে দিতে পারত। কেন তা করেনি?

প্রিয়বর্ধন আমার হাবভাব দেখে হয়তো অবাক হল। বলল, 'কী হল? চলে এস এখানে। তোমার জন্য কিছু ব্রেকফাস্টের আয়োজন করেছি।'

বলে সে হাসতে হাসতে একটা পোড়া মাছ দেখাল। সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্ষিদে চনমন করে উঠল। তার সম্পর্কে রাগ আর শত্রুতার ভাবটাও কেটে গেল। তার কাছে গিয়ে বসে পড়লুম। সে একরাশ কাঠকুটো জড়ো করে আগুন জেলেছে। আগুনের কুণ্ডের পাশে কয়েকটা পোড়া আর কয়েকটা তাজা মাছ। মাছগুলো দেখতে বাচ্চা ইলিশের মতো। আমার হাতে একটা পোড়া মাছ গুঁজে দিয়ে প্রিয়বর্ধন নিজেও একটা চিবুতে শুরু করল। চিবুতে চিবুতে বলল, 'তুমি অবাক হচ্ছ না মিস্টার?'

বললুম, 'নিশ্চয় হচ্ছি। কারণ এতক্ষণ আমাদের হাঙ্গরের পেটে থাকার কথা।'

প্রিয়বর্ধন আরও জোরে হেসে বলল, 'বরাত জোরে এ যাত্রা জোর বেঁচে গেছি। আসলে কী জানো? ওই রবারের ভেলাগুলো খুব মজবুত এবং বিশেষ ধরনে তৈরি। যত ঢেউ থাক, কিছুতেই ওল্টাবে না। তাছাড়া আমি হলুম সমুদ্রের বাচ্চা। আজীবন সমুদ্রে মানুষ হয়েছি।'

বাধা দিয়ে বললুম, 'কিন্তু এখানে এলুম কী ভাবে?'

'যেভাবে আসা উচিত।' প্রিয়বর্ধন আগুনে আরেকটা মাছ রেখে বলল। 'সারা রাত আমরা ভেলায় কাটিয়েছি। তুমি তো ভিরমি খেয়ে পড়ে ছিলে ভয়ের চোটে। অগত্যা তুমি যাতে ভেলা থেকে ছিটকে হাঙ্গরের পেটে ঢুকে না যাও, আমি তোমার পেটের ওপর পা চাপিয়ে ঠেসে রেখেছিলুম।'

নচ্ছার লোকটা আমার পেটের ওপর পা চাপিয়েছিল ক্যারিবোর মতো, ভাবতেই গা জ্বালা করে। কিন্তু লোকেটাকে যতটা খারাপ মনে করেছিলুম, ততটা খারাপ নয়। বললুম, 'তারপর এখানে কিভাবে এলুম?'

প্রিয়বর্ধন বলল, 'ভোর নাগাদ ভেলামশাই নিজের ইচ্ছে মতো এনে ফেলল এই সৃষ্টিছাড়া দ্বীপে। আমি কি নিজের ইচ্ছেয় এসেছি? ওই যে বাঁধের মতো টিলা পাহাড় দেখছ, তার নিচে সমুদ্র। বাপ্‌স। কিনারা জুড়ে ডুবো পাথরে ভর্তি—ভেলাটার সঙ্গে টোক্কর লাগলে দুজনেই গুঁড়ো হয়ে যেতুম। বুঝলে মিস্টার? ভেলাটাকে পুজো করা উচিত। ওই দেখ, ওকে গাছে টাঙিয়ে রেখেছি।'

তুমি নিশ্চয়ই নারকেল গাছে চড়তে পারো ?

গাছের গুঁড়ির মাথায় চুপসে যাওয়া প্রকাণ্ড টায়ারের মতো ভেলাটাকে দেখতে পেলুম। বললুম, 'আমি তাহলে সারারাত অজ্ঞান ছিলুম ?'

'হুঁ, ছিলে। কাজেই তোমার ঠ্যাং দুটো ধরে টানতে টানতে বিচে নামাতে হল। তারপর একবার ভাবলুম, তোমাকে বিচেই ফেলে রাখি। কিন্তু এই জঘন্য দ্বীপে বা শকুনের উপদ্রব! তোমাকে একা ফেলে যে ক্ষিদে মেটাতে আসব, উপায় নেই। তবে তার চেয়ে বড় কথা, আমি নারকোল গাছে চড়তে পারি নে। সমুদ্রের বাচ্চা তো! তাই ভাবলুম, তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। তুমি নিশ্চয় নারকোল গাছে চড়তে পারো ?'

'মোটেও পারি না।'

প্রিয়বর্ধন লাফিয়ে উঠল। 'পারো না ? তাহলে কেন তোমাকে কাঁধে করে এই নিরাপদ জায়গায় নিয়ে এলুম ?'

বুঝতে পারছিলুম, লোকটি খুব আমুদে প্রকৃতির। সে আমাকে বয়ে এনে এখানে শুইয়ে রেখেছে। তারপর হ্রদের জলে পাথর ছুঁড়ে একগাদা মাছ মেরে এনেছে। কিন্তু আগুন কোথায় পেল ? জিগ্যেস করলে তার বুদ্ধির পরিচয়ও পেলুম। দুটো শুকনো কাঠে ঘষাঘষি করে শুকনো পাতা ডলাই করে গুলতি বানিয়ে ফুঁ দিতেই আগুন জ্বলে উঠেছে। ব্যাপারটা ভারি সোজা। প্রথমে কাঠ দুটো জ্বলে উঠবে। তখন গুঁড়ো পাতার গুলতিটা ধরিয়ে নিলেই হল।

রোদে শুষে থাকার ফলে আমার ভিজে পোশাক যেমন শুকিয়ে গেছে, তেমনি সারা রাতের সমুদ্র জলের হিমটাও

গেছে ঘুচে। সূর্য মানুষের শরীরকে শক্তি যোগায়। আমি এখন সম্পূর্ণ ফিট হয়ে গেছি। একটুও দুর্বলতা টের পাচ্ছি না।

হ্রদটা ছোট। সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ নেই। বৃষ্টি-জলের হ্রদ। তাই জলটা পান করা যায়। খুব স্বচ্ছ সেই জলে মাছের ঝাঁক দেখে তাক লেগে গেল।

জল খেয়ে সেই গাছের তলায় ফিরে প্রিয়বর্ধন বলল, 'একেই বলে বরাত। কাল সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত আমরা ছিলুম শত্রু। এখন হয়েছি বন্ধু। যাক্ গে, তোমার নামটা কী বলছিলে যেন কাল?'

'জয়ন্ত চৌধুরি!'

'জয়ন্ত, আমরা কোথায় এসে পড়েছি জানো?' বলে সে ভয়ের চোখে চারদিক দেখে নিল। 'আমার খালি সন্দেহ হচ্ছে, এ যেন সেই ডাইনির দ্বীপ।'

'ডাইনির দ্বীপ মানে?'

'ছেলেবেলা থেকে নাবিকদের কাছে ডাইনির দ্বীপের ভয়ঙ্কর সব গল্প শুনেছি। থাক্ গে, ওসব বলতে নেই। বললেই বিপদ হবে শুনেছি। আমাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্রও নেই। তোমার পকেটে একটা রিভলবার ছিল। সেটা কাছে রেখেছি। কিন্তু জলে ভিজে অকেজো হয়ে গেছে। গুলিগুলো পর্যন্ত বের করা গেল না।'

'আমার রিভলবার নিয়েছ কেন? ফেরত দাও।'

মুচকি হেসে প্রিয়বর্ধন পকেট থেকে আমার অস্ত্রটা বের করে দিল। পরীক্ষা করে দেখলুম, সত্যি ওটা অকেজো হয়ে গেছে। প্রিয়বর্ধন বলল, 'আমার স্টেন-গানটা কখন সমুদ্রে ছিটকে পড়েছে টের পাইনি। যাক্ দুটো লাঠি ভেঙে নিই গাছের ডাল থেকে। তারপর সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসব—যদি দৈবাৎ কোনো জাহাজ চোখে পড়ে। নিদেনপক্ষে ভেলাটা তো রইলই। গায়ে জোর ফিরে পেলেই ভেসে পড়া যাবে।'

সমুদ্রতীরে খাবার সময় নারকোল বনের ভেতর অসংখ্য শুকনো নারকোল পড়ে থাকতে দেখলুম। কিন্তু প্রিয়-বর্ধনের শুকনো নারকোল নাকি মুখে রোচে না। গাছের ডগায় ঝুলন্ত নরম নারকোল শাঁসের কথা বলতে তার জিভে জল এসে গেল। আমাকে গাছে চড়ানোর জন্য সাধাসাধি করেও যখন রাজি হলুম না, তখন তার মুখটা বেজার হয়ে উঠল। কিন্তু আমি জানি, এই দ্বীপ থেকে উদ্ধার না পেলে তাকে শুকনো নারকেলই খেতে হবে। কাহাঁতক মাছপোড়া খেতে ভাল লাগবে ওর? আমি পাথরে আছাড় মেরে কয়েকটা নারকোল ভেঙে ফেললুম। তারপর টুকরো শাঁসগুলো জামা ও প্যান্টের পকেটে বোঝাই করলুম। ন্যাড়া পাথরের বাঁটে বসে যখন সেগুলো চিবুচ্ছি, তখন প্রিয়বর্ধন হাত বাড়িয়ে বলল, 'দেখি একটুখানি!'

কিছু চিবিয়েই সে ফেলে দিল। তবে একথাও সত্যি এমন স্বাদ গন্ধহীন নারকোল জীবনে কখনও খাইনি। বুবিদ্বীপের নারকোল খেকো চিংড়িগুলোর কথা মনে পড়ছিল। আহা, সেই সুস্বাদু চিংড়ি সমুদ্র থেকে যদি ধরা যায়। লোভী চোখে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

ডুবো পাথরে বহুদূর পর্যন্ত সমুদ্রের নীল জলে কালো কালো ছোপ পড়ে আছে। যেন অসংখ্য দানবের মাথা। কোনোটা হাতির মতো দেখাচ্ছে। পাথরগুলো ডুবে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে। শাদা ফেনার পুঞ্জ জমছে। জলের শব্দও প্রচণ্ড। ওই সব পাথরের ভেতর দিয়ে চৌক্কর খেতে খেতে রবারের ভেলাটা ভদ্রলোকের মতো আমাদের তীরে পৌঁছে দিয়েছে। সত্যি, ভেলা-বাবাজীর পুজো দেওয়া উচিত।

দিগন্তে মাঝে মাঝে কালো রেখা ভেসে উঠছিল। নিশ্চয় আর একটা দ্বীপ। কিন্তু দূরের দিকে কোনো জাহাজ বা নৌকো চোখে পড়ছিল না। প্রিয়বর্ধন ঠোঁট কামড়ে ধরে সমুদ্র দেখছিল। কিছুক্ষণ পরে ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বলল, 'শয়তান ক্যারিবোকে যদি এখন পেতুম! ওর মুণ্ডুটা কচকচ করে খেয়ে ক্ষিদে মেটাতুম!'

'ক্যারিবো তোমাকে ফেলে পালিয়ে গেল কেন প্রিয়বর্ধন?'

আমার প্রশ্ন শুনে প্রিয়বর্ধন চুপচাপ পাথরে লাঠিটা দিয়ে আঁচড় কাটবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'কিয়াংকে ও ভীষণ ভয় পায়। কিয়াং কোটিপতি লোক। ওর দলবল বিরাট। ক্যারিবো তো এক সময় কিয়াংয়েরই ডান হাত ছিল।'

'দুজনের বিবাদের কারণ কী?'

'রোমিলার বাবা রাজাকোর ঘর থেকে যে দেবী-মূর্তিটা চুরি করে এনে ক্যারিবোকে দিয়েছি, বিবাদ ওইটে নিয়ে। জিনিসটার আসল মালিক হল কিয়াং। ক্যারিবো ওটা কিয়াংয়ের বাড়ি থেকে চুরি করে রাজাকোকে বেচেছিল। কিয়াং ক্যারিবোকেই সন্দেহ করেছিল। তাই তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছিল। ক্যারিবো রাজাকোর সেই টাকায় স্কুনার কিনেছিল। তারপর যেভাবেই হোক, সে জানতে পেরেছিল, মূর্তিটার ভেতর কিওটা দ্বীপের সন্ধান লেখা আছে।'

চমকে উঠলুম। 'কিতটা দ্বীপের? মানে—যে দ্বীপে গাছপালা কথা বলে?'

প্রিয়বর্ধন হাসল। আমার ভুল শুধরে দেওয়ার ভঙ্গীতে বলল, 'উঁচু—গান গায়।'

'বেশ। তারপর?'

'তারপর আর কী? ক্যারিবো আমাকে টাকার লোভ দেখাল। তাছাড়া প্রতিজ্ঞা করে বলল, আমাকেও কিওটা দ্বীপে নিয়ে যাবে। আমি শয়তানটার কথায় পড়ে রোমিলার মতো ভাল মেয়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেললুম। ওঃ! নরকে আমার জায়গা হবে না জয়ন্ত!'

অনুতাপে সে চুল আঁকড়ে ধরল। বললুম, 'যাক গে, যা হবার হয়ে গেছে। এখন আর পড়ে লাভ নেই। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় কিয়াংয়ের দলই কি ক্যারিবোর স্কুনার হামলা করেছিল? কেন?'

'কিয়াং নিশ্চয় টের পেয়েছে, মূর্তিটা এতদিন রাজাকোর কাছে ছিল এবং আবার সেটা ক্যারিবোর কাছে ফিরে এসেছে। কিয়াংয়ের চারদিকে চর।'

'তাহলে কি রাজাকোকে খুন করেছে কিয়াংয়েরই লোক?'

'তা আর বলতে?

এসব কথা শুনে মমনরা হয়ে বললুম, 'তাহলে এতক্ষণ ক্যারিবো কিওটা দ্বীপের দিকে রওনা হয়েছে। হয়তো পৌঁছেও গেছে।'

প্রিয়বর্ধন জোরে মাথা নেড়ে বলল, অত সহজ নয়। মোটরবোট নিয়ে কিওটা যাবে? আমার মনিব রাজাকো একদিন নেশার ঘোরে আমাকে বলেছিলেন, কিওটা নামে একটা দ্বীপ আছে—তার চারদিকে পাহারা দেয় জলের ডাইনিরা। কাজেই বুঝতে পারছ, এতক্ষণ ক্যারিবোর মাংস ডাইনিরা ছিঁড়ে খাচ্ছে।'

'কিন্তু প্রিয়বর্ধন, গান করে এমন সব গাছ দেখাতেই বা এত আগ্রহ কেন ক্যারিবোর? কেন সেখানে কিয়াংই বা যেতে চায়?'

প্রিয়বর্ধন চাপা গলায় বলল, 'ওই দ্বীপে নাকি প্রাচীন যুগের জল দস্যুদের বিস্তর ধনরত্ন লুকানো আছে।'

হেসে ফেললুম। 'সেই চিরকেলে গল্প! গুপ্তধন আর গুপ্তধন! প্রিয়বর্ধনে, গুপ্তধনের গল্প কখনও সত্য হয় না।'

প্রিয়বর্ধন আমার পরিহাসে কান করলনা। বলল, 'তুমি জানো না জয়ন্ত, কোকোস আইল্যাণ্ড কেন, সারা তল্লাটে যেখানে যাবে, তুমি কিওটা দ্বীপের অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনতে পাবে। সেখানকার গাছপালা গান গেয়ে সেই গুপ্তধনের খোঁজ দেয়। গানের সুরে বলে, আয়, তোকে রাজা করে দিই!'

প্রিয়বর্ধন কিওটা দ্বীপের বিচিত্র সব গল্প বলতে থাকল। আমি ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছিলুম। এতদিন কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের সঙ্গে কত অ্যাডভেঞ্চারে গিয়ে কত না বিপদে পড়েছি। কিন্তু চরম মুহূর্তে উনি ত্রাণকর্তার মতো আমার উদ্ধারে হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে হাজির হয়ে সহাস্যে সম্ভাষণ করেছেন, 'হ্যাল্লো ডার্লিং!' এই দ্বীপে নির্বাসিত হয়েও তাঁর আশা করতে দোষ কী?...

কিন্তু দিনটাই বৃথা কেটে গেল। উদ্ধার হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখলুম না। দুপুরে দুজনে ওদের জলে স্নান করলুম। আবার সেই পোড়ামাছের লাঞ্চ। আবার জাহাজের আশায় সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসে থাকা। তারপর দিন ফুরিয়ে আসছে দেখে রাতের আশ্রয়ের কথা ভাবতে হল দুজনকে। কাল সকালে বরং ভেলায় ভেসে পাড়ি জমানোর কথা ভাবা যাবে।

এই দ্বীপটা খুবই ছোট। উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে সেটা বুঝতে পেরেছিলুম। হ্রদের অন্যদিকটায় জঙ্গলের ভেতর কালো পাথরের কয়েকটা পাহাড়দেখা যাচ্ছিল। ওখানে আমরা আরামে রাত কাটানোর মতো একটা গুহা আবিষ্কার করে ফেললাম।

সারাদিন কোনো জনমানুষ দেখিনি। প্রাণী বলতে কয়েকটা গিরগিটি দেখেছি আর এক দঙ্গল শকুন! তারা কী খেয়ে বেঁচে থাকে কে জানে! গুহার ভেতর ঢুকে আগুন জ্বালিয়ে ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচা গেল। এখানকার শুকনো কাঠগুলোর আশ্চর্য গুণ। একটু ঘষলেই ধোঁয়া উঠতে থাকে। সহজে আগুন ধরে যায়।

গুহার ভেতরটা বেশ মসৃণ। দরজাটা বড়। দরজার কাছে বসে প্রিয়বর্ধন লাঠি হাতে পাহারা দিচ্ছিল। একরাশ কাঁচা পাতা আর ঘাস ছিঁড়ে এনে বিছানা করেছি। ক্লান্তিতে ঘুম এসে গিয়েছিল। আমার ঘড়িটা ভাগ্যিস অক্ষত আছে। প্রিয়বর্ধনের ঘড়িটাও অটুট দিব্যি সময় দিচ্ছে। পালাক্রমে দুজনে ঘুমোব এবং পাহারা দেব।

সবে চোখ বুজেছি। বাইরে অন্ধকার ঘন হয়েছে। গুহার ভেতর আগুনটা ধিকিধিকি জ্বলছে এবং প্রিয়বর্ধন গুণগুণ করে কী গান গাইছে অজানা ভাষায়। হঠাৎ তার গান থেমে গেল। চাপা গলায় সে বলে উঠল, 'জয়ন্ত! জয়ন্ত! ঘুমুলি নাকি?'

চমক খেয়ে উঠে বসে বললুম, 'কী হয়েছে?'

"ঝটপট আগুনটা নিভিয়ে ফেলো। এদিকে একটা আলো এগিয়ে আসছে।'

প্রিয়বর্ধনের গলার স্বর কাঁপছিল। আমি আগুনের কুণ্ডে একরাশ কাঁচা পাতা চাপিয়ে দিয়ে দরজায় উঁকি দিলুম। নিচে হ্রদের ধারে সত্যি একটা আলো। তবে আলোটা এগিয়ে আসছে না। থেকে আছে। (ক্রমশঃ)

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ

তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়

*

সৌর চালিত হাত ঘড়ি আমেরিকার বাজারে এসে গেছে। দাম মাত্র 200 ডলার বা ভারতীয় মুদ্রায় 2000 টাকা। এই ঘড়ি তৈরীর কৌশল আবিষ্কৃত করেছেন একটি কম্পিউটার ও সৌর শক্তি বিশেষজ্ঞ রজার বিহেল। এই হাত ঘড়ির ভিতরে রয়েছে ধাতুর কোষ (সিলিকন) বা ব্যাটারী। যা সূর্য্যের আলোকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তিত করে।

**

সম্প্রতি জাপানের এক কোম্পানি বর্তমানে ভাসমান হোটেল তৈরী করেছে। যে হোটেলটাকে যে কোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়া যাবে। এর দৈর্ঘ্য 120 মিটার, 39 তলা বিশিষ্ট এই হোটেল।

***

সম্প্রতি একটি খবরে জানা গেছে বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীনতম মানুষ হলেন মিশরের হাবিব ইব্রাহিম। তাঁর বয়স একশ ষাট বৎসর। এছাড়া এও জানা গেছে যে তিনি এখন অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ও নিয়মিত পেনসন গ্রহীতা।

****

সম্প্রতি একজন চীনা ডাক্তার চুল হীন ব্যক্তিদের মাথার টাকে চুল গজানোর এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেছেন। এই ডাক্তারের নাম ইয়ানসিকিস। তিনি শরীরের তিনটি জায়গা যথা দুটি গলা ও একটি মাথায় সুঁচ ফুটিয়ে চুল গজানোর চিকিৎসা করেন। তিনি বর্ত্তমানে বেজিং হাসপাতালে কর্মরত।

*****

সম্প্রতি এক খবরে জানা গেছে আকাশে "ভ্যান-মা অ্যান" বলে একটি নক্ষত্র আছে। যা থেকে এক গ্লাস কিছু ভরে নিলে তার ওজন হবে প্রায় আশি টন। যা বহন করতে প্রায় ৬টি মাল গাড়ির প্রয়োজন হবে।

বি টু—351 2, বিশ্বকর্মা নগর, সেকটর II
দুর্গাপুর, বর্ধমান।

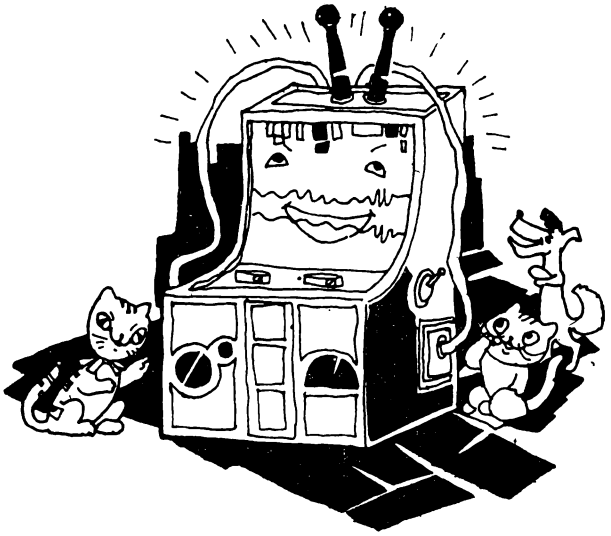

হাসিকল / সুধীন্দ্র সরকার

আজগুবি এ গল্প না,
হল্লা-হাসির জল্পনা,
সামনে গেলেই ফেলবে হেসে—
কম্পুটারের কল্পনা!
আজব বটে মেসিনখানা,
ইঁদুর, বেড়াল, কুকুর ছানা
রামগড়ুরও হেসে লুটোয়,
সত্যি যাদের হাসতে মানা!
সেই মেসিনের অন্তরে
বিদঘুটে সব যন্তরে,
হল্লা-হারি আটকে আছে—
ইলেকট্রনিক মন্তরে।
সুইচ টিপে রাখলে ধরে,
না শোনা এক শব্দ ছোঁড়ে;
শব্দ কাঁপন গেলেই কানে—
সুড়সুড়িতে হাসবে জোরে!
গোমড়ামুখো, দুষ্টুপাজী,
গম্ভীর বা বদমেজাজী,
ওর পাল্লায় হাসবে ঠিকই,
হাসানোটা ওর যে কাজই।
আবিস্কর্তা হন অধীর,
টেন্‌সনে খান ঘোল-দধির,
হাসিকলের ত্রুটি শুধু—
হাসছেনা তো মূক-বধির!

48/1, কলুপাড়া লেন, কলকাতা-31

পদার্থবিদ্যা

অলক চক্রবর্তী

এর আগে আমরা তাপ সংক্রান্ত অধ্যায়গুলিতে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরের আলোচনা করেছিলাম।

এবার আসি নিউটনের গতিসূত্র অধ্যায়ে। ধারাবাহিক ভাবে যে আলোচনা চলছে, তার থেকে সুফল পেতে হলে তোমরা আগে পাঠ্যাংশে চোখ বুলিয়ে নাও, ভালো করে। তারপর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ো।

এবার আসি কাজের কথায়!

প্রশ্ন 1 : নিউটনের প্রথম গতিসূত্রকে কখনও কখনও 'জাড্যের সূত্র'ও বলে, কেন?

উত্তর 1 : জাড্য হল বস্তুর নিজের এক ধর্ম, যার জন্য জড়বস্তু বাইরে থেকে বল না দিলে নিজের থেকে নিজের স্থির অবস্থা বা সমানবেগে সরলরেখায় চলমান অবস্থার কোন পরিবর্তন করতে পারে না। অর্থাৎ বাইরে থেকে বল না দিলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে এবং সচল বস্তু চিরকাল সরলরেখায় সমান বেগে চলতে থাকবে। কিন্তু এটাই নিউটনের প্রথম গতিসূত্র। কাজেই, ঐ সূত্র বস্তুর জাড্যের সংজ্ঞা দেয় বলে ওকে 'জাড্যের সূত্র'ও বলে।

প্রশ্ন 2 : একটা চলন্ত ট্রেনের কামরার মধ্যে পাশা-পাশি আসনে দুজন লোক পরস্পর স্থিতিশীল—একথা বলার মানে কি?

উত্তর 2 : লোক দুজন ট্রেনের কামরার মধ্যে অন্যান্য বস্তুর সাপেক্ষে এবং নিজেরা একে অন্যের সাপেক্ষে স্থান পালটায় না বলে ওদের স্থিতিশীল বলে।

প্রশ্ন 3 : একজন ক্রিকেট খেলোয়ারকে বল ধরবার সময়ে হাত একটু নীচে নামিয়ে নিতে হয় কেন?

উত্তর 3 : গতিশীল অবস্থাতে বলটা হাতে এসে পড়লে হাতের ওপর একটা কাজ করা বল দেয় এবং হাতও বলটার ওপর প্রতিক্রিয়া বল দেয়। বলটাকে বল দেওয়ার জন্যেই হাত একটু নীচের দিকে (বা প্রযুক্ত বলের দিকে) গতিশীল হবার চেষ্টা করে। হাতকে বলের দিকে কিছুটা সরিয়ে নিলে প্রতিক্রিয়া বল কম হয় বলে হাতে আঘাতও কম লাগে।

প্রশ্ন 4 : একটা কাচের গ্লাসের মুখে একটা কার্ড রেখে ওর ওপর একটা পয়সা রেখে তারপর কার্ডটাকে জোরে টোকা মারলে পয়সাটা বাইরে না পড়ে গ্লাসের মধ্যে পড়ে কেন?

উত্তর 4 : কার্ডটার ওপর থাকায় ঐ সময় ওতে স্থিতিজাড্যের উৎপত্তি হয়। কার্ডটাকে টোকা মারলে কার্ডটা বেরিয়ে যায়, কিন্তু স্থিতিজাড্যের জন্যে পয়সাটা নিজের জায়গাতেই স্থির থাকতে চায় বলে ওর নীচে তখন কার্ডটা না থাকায় ওটা গ্লাসের ভেতরে পড়ে যায়।

প্রশ্ন 5 : নরম কার্পেটের চেয়ে সিমেন্টের মেঝেতে পড়তে বেশী ব্যথা লাগে কেন?

উত্তর 5 : নরম কার্পেট বা সিমেন্ট যে কোন মাটির ওপর পড়লেই ওদের ওপর ক্রিয়াবল পড়ে এবং ওরাও আমাদের দেহে একটি প্রতিক্রিয়া বল দেয়। সিমেন্টের মেঝেতে এই প্রতিক্রিয়া বল নরম কার্পেটের চেয়ে বেশী বলে বেশী ব্যথা লাগে।

প্রশ্ন 6 : বাতাস ছাড়া জায়গায় পাখী আকাশে উড়তে পারে না, কেন?

উত্তর 6 : ওড়বার সময়ে পাখী ডানা দিয়ে বাতাসে বল দেয় (ক্রিয়াবল) এবং বাতাসও পাখীর ডানার ওপর সমান ও বিপরীতমুখী বল দেয় (প্রতিক্রিয়া বল)। কিন্তু বাতাস ছাড়া জায়গায় ঐরকম ঘটতে পারে না বলে পাখী সেখানে উড়তে পারে না।

প্রশ্ন 7 : আকাশে ওপর দিকে উড়ে যাবার সময় পাখী কেন ডানা দিয়ে বাতাসকে নীচের দিকে ঠেলে দেয়?

উত্তর 7 : ওপরদিকে ওড়ার সময়ে পাখী ডানা দিয়ে বাতাসে একটা নীচের দিকে বল (ক্রিয়াবল) দেয় এবং বাতাসও ওর ওপর সমান ও বিপরীতমুখো প্রতিক্রিয়া বল দেয়; ফলে, পাখী ওপরের দিকে উঠে যেতে পারে।

প্রশ্ন 8 : একটা চলন্ত সাইকেলকে গতিশীল রাখতে যে বলের দরকার হয়, স্থির অবস্থা থেকে চালাতে ওর ওপর তার চেয়ে বেশী বল দিতে হয়, কেন?

উত্তর 8 : চলন্ত সাইকেল ওর গতিজাড্যের জন্যে ওর গতি বজায় রাখতে চায়। তবে ঘর্ষণের জন্যে বাধা ও বাতাস চলাচলের জন্যে বিরুদ্ধ বাধা থাকার জন্যে ওর ঐ গতি কমে আসে বলে ঐ বাধাগুলো পার হয়ে যেতে ওটা গতিশীল থাকতে পারে, সেইজন্যেই একমাত্র একটু বল দেবার দরকার। কিন্তু স্থির অবস্থা থেকে সবল করতে গেলে সাইকেলের ভর অনুযায়ী ওর স্থিতিজড়তাকে পার হয়ে ওকে অনেক বেশী বাধার সামনে দাঁড়াতে হয় বলে আগে চেয়ে বেশী বল দিতে হয়।

প্রশ্ন 9 : সমান বেগে ছুটে যাওয়া একটা ক্রিকেট বল ধরা একটা টেনিস বল ধরার চেয়ে কঠিন কেন?

উত্তর 9 : ক্রিকেট বলের ভর টেনিস বলের চেয়ে বেশী হওয়ায় সমান বেগে ছুটে যাওয়া ওর ভরবেগ বেশী। তাই ওকে থামাতে বেশী বল (ক্রিয়া) দিতে হয়, ফলে হাতের ওপর প্রতিক্রিয়া বলের মানও বেশী হয়। সেই জন্যে একটা ক্রিকেট বল ধরা টেনিস বলের চেয়ে কঠিন, ওরা সমানবেগে ছুটে গেলেও।

প্রশ্ন 10 : ত্বরণের এককে সময়ের একক দুবার আসে কেন ?

উত্তর 10 : আস্তে আস্তে বাড়ছে এরকম বেগে চলছে কোন বস্তুর বেগ বাড়ার হারই ত্বরণ। তাই ত্বরণে সময়ের একক একবার 'বেগ' বোঝাতে এবং আর একবার বেগ পালটানোর 'হার' বোঝাতে আসে।

$$\text{ত্বরণ} = \frac{\text{বেগ বাড়া}}{\text{সময়}} = \frac{\text{দূরত্ব / সময়}}{\text{সময়}}$$
$$= \text{দূরত্ব / (সময়)}^2$$

প্রশ্ন 11 : দুটো বাড়ীর মধ্যে সরলরেখার দূরত্ব 1/2 মাইল। একটা বাড়ী থেকে ঘুরপথে $1\frac{1}{2}$ মাইল হেঁটে অন্য বাড়ীটাতে গেল সরণ কত হবে ? সোজাপথে (সরলরেখা দিয়ে) একটা বাড়ী থেকে অন্যটাতে গিয়ে আবার ফিরে আসলে সরল কত হয় কেন ?

উত্তর 11 : সরণ $\frac{1}{2}$ মাইল হবে।

দ্বিতীয়বারে, সরণ শূন্য হবে, প্রথম ও শেষ অবস্থানের সরলরৈখিক দূরত্ব শূন্য বলে।

প্রশ্ন 12 : মন্দনকে ঋণাত্মক ত্বরণ বলার কারণ কি ?

উত্তর 12 : কোন গতিশীল বস্তুকণার গতিতে ত্বরণ সৃষ্টি হলে, ওর বেগ আস্তে আস্তে বাড়ে। বস্তুকণাটার গতিতে মন্দন সৃষ্টি হলে, ওর বেগ আস্তে আস্তে কমে। কাজেই ত্বরণকে যদি ধণাত্মক ধরি, তবে মন্দন ঋণাত্মক। ঐজন্যেই মন্দনকে ঋণাত্মক ত্বরণ বলে।

প্রশ্ন 13 : চলন্ত রিক্সা হঠাৎ থেমে গেলে বসা লোকটা সামনের দিকে ছিটকে পড়ে কেন ?

উত্তর 13 : রিক্সায় থাকার সময়ে বসা লোকটার দেহে গতিজাড্যের সৃষ্টি হয় ওটা রিক্সার গতি পায়। রিক্সা হঠাৎ থেমে গেলে বসা লোকটা গতিজাড্যের জন্যে আগের ঐ গতি বজায় রাখতে চেষ্টা করে বলে বসা লোকটা সামনের দিকে ছিটকে পড়ে (রিক্সার অংশগুলো ওর সঙ্গে শক্ত আটকানো থাকে বলে সেগুলো ওরকম পড়ে যায় না)।

প্রশ্ন 14 : দৌড় প্রতিযোগীতায় প্রতিযোগী দৌড়ের সীমা নির্দেশক ফিতের কাছে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে থামতে পারে না কেন ?

উত্তর 14 : দৌড়নোর সময় প্রতিযোগীর দেহে গতিজাড্যের সৃষ্টি হয়। দৌড়ের সীমা-নির্দেশক ফিতের কাছে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগী থামতে চাইলেও ঐ গতিজাড্যের জন্যে আরো কিছুক্ষণ গতিশীল থাকে।

প্রশ্ন 15 : তুমি একটা বইকে ঠেললে, নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী বই ত তোমাকে উল্টোদিকে ঠেলল। তবে বইটা নড়ে কি করে ?

উত্তর 15 : বইটা যে তলে থাকে, সেই তলটা এবং বইয়ের পৃষ্ঠ তলের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া বলের (ঘর্ষণ) সৃষ্টি হয়, সেই বলটা বইটাকে গতিশীল হতে বাধা দেয়। ক্রিয়াবলের মান বাড়ালে ঐ ঘর্ষণ বলের মানও বাড়ে। ঐভাবে যে বলটা দেওয়া হচ্ছে তার মান একটা বিশেষ সীমায় আসলে ঐ ঘর্ষণ বলের মান সবচেয়ে বেশী হয়। ওর চেয়ে বেশী বল দিলে বইটা গতিশীল হয় (যেহেতু তখন ঘর্ষণবলের থেকে যে বল দেওয়া হয়েছে সেই ক্রিয়াবলের মান বেশী হয়)।

প্রশ্ন 16: একটা রোলারকে ঠেলার চেয়ে টানা সোজা কেন ?

উত্তর 16 : একটা রোলারে বল দিয়ে ঠেলবার সময় ঐ বলকে ওর ভূমি ও লম্ব এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ভূমির অংশটা রোলারকে সামনের দিকে চালায় কিন্তু লম্ব অংশটা নীচের দিকে বলে ওটা রোলারের আপাত ওজন বাড়ায়, ফলে ভূমি দিয়ে ওর ওপর যে প্রতিক্রিয়া বল দেয়া হয়, তা বেড়ে যায় বলে রোলারকে চালাতে কষ্ট হয়। কিন্তু রোলারকে বল দিয়ে টানবার সময় যে বল দেয়া হয়, সেই বলকে ভূমি ও লম্ব এই দু ভাগে ভাগ করলে লম্ব অংশটা ওপর দিকে কাজ করে বলে রোলারের আপাত ওজন কমে যায় ; ফলে ওর ওপর ভূমির প্রতিক্রিয়া বলও কমে যায় এবং রোলারকে আগের চেয়ে সহজ গতিশীল করা যায়।

প্রশ্ন 17: একটা বেলুনে বাতাস ভরে ওর মুখ খুলে নীচের দিকে রাখলে বেলুনটা নীচের দিকে উঠে যায় কেন ?

উত্তর 17: বাতাস ভরে একটা বেলুনের মুখ নীচের দিকে খুলে দিলে ওর ভেতরের বাতাস খুব জোরে নীচের দিকে বের হতে থাকে। ফলে বাতাসের স্তরে একটা ক্রিয়াবলের সৃষ্টি হয়, বাতাসও বেলুনটার ওপর ঐ বলের সমান ও উলোমুখো একটা প্রতিক্রিয়া বল দেয়। এর ফলে বেলুনটা ওপরের দিকে উঠে যায়।

জয়পুরিয়া কলেজ, কলিকাতা-5

ছোটদের বড় বইমেলা

কিন্নর রায়

না গরম না শীত, এমন একটা সময়ে ময়দানে ছোটদের বই মেলা। মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল টিনটিন আর নিউট্রিনের সেই মজার খরগোস। টিনটিন হাত মেলাচ্ছিল বাচ্চাদের সঙ্গে। খরগোস ও হাত নেড়ে নেড়ে ডাকছিলো ছোটদের।

মাইকে গান ছিলো, কখনও আলিবাবা নাটক, কখনও ঠাকুরমার ঝুলি। চড়া রোদের দুপুরে হিন্দি ফিল্মের গানও গেছে শোনা। পাক নিচ্ছিলো চরকি, নাগর দোলা।

সামনে পরীক্ষা, পড়াশুনোর চাপ, এমন একটা চিন্তা-মেশানো সময়ে এই মেলায় বাচ্চাদের থেকে বড়দের ভীড়ই বেশি। কি এমন ক্ষতি হতো এ মেলাকে ক'দিন পিছিয়ে নিয়ে এলে!

কলকাতায় ছোটদের বই মেলা এই প্রথম। উদ্যোক্তা ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট। সময়টা চার থেকে চোদ্দ নভেম্বর। গেট হয়েছিল রামধনুর সাত রং দিয়ে। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে, বেশ বড় সড় এক খানা ব্রিজ, তার গায়ে সাত সাতটা রং। গেটের দিকে তাকাতে তাকাতেই দিব্যি ঢুকে যাওয়া যায় মেলায়। যদি অবিশ্যি টিকিট থাকে হাতে।

টিকিট কাটতে গেলে খরচ পঞ্চাশ পয়সা। তারপর মেলাতে ঢুকলেই অজস্র বই আর বই। দেশী এবং বিদেশী। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট বানিয়েছিলেন তিনটি প্যাভিলিয়ন। একটিতে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের বই। অন্য দুটি দেশী এবং বিদেশী বইয়ে সাজানো। প্রায় দু লক্ষ স্কোয়ার ফুট জমির ওপর ছোট বড় মিলিয়ে স্টল ছিলো একশো চার। প্রায় শ তিনেক প্রকাশক এসে-ছিলেন ছোট বড় মিলিয়ে। কলকাতা ছাড়াও আমেদাবাদ, চণ্ডীগড়, মাদ্রাজ, গৌহাটি থেকে এসেছিলেন প্রকাশকেরা।

বারোটা ভারতীয় ভাষায় পাঁচ হাজার আলাদা আলাদা মলাট মোড়া বই দেখা গেছে। আর প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভিন্ন ভিন্ন নামের বিদেশী বই। এরা এক এক জন সংখ্যায় ছিল অনেক।

মেলার উদ্বোধক প্রমেন্দ্র মিত্র। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্রও। এ মেলার যাবতীয় খরচপত্তর ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের। দিল্লি থেকেই তাঁরা এনেছিলেন স্টল সাজানোর জিনিসপত্র।

কথা হচ্ছিলো ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের বাংলা এডিটর অরুণ চক্রবর্তীর সঙ্গে। রঙিন কাপড়ে তৈরি ছিমছাম প্রেস কর্ণার। ঘরের কোণে চলমান টি. ভি.। তাঁর কথায়, কলকাতায় এই প্রথম শিশু বই মেলা। এ ব্যাপারে যা ভিড় এবং উৎসাহ দেখছি, তা আমাদের কাছে যথেষ্ট আশা ব্যাঞ্জক। মেলাচলার তৃতীয় দিনেই প্রায় হাজার দশেক মানুষজন এসেছিলেন। অরুণবাবু জানালেন, শুধু মেলাই নয়, লেখক আর শিল্পীদের নিয়ে নানান রকম ওয়ার্কশপ আর সেমিনারের আয়োজন হয়েছে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের পক্ষ থেকে। পূর্বাঞ্চলের প্রতিবেশী রাজ্যের শিশু সাহিত্যিকরাও এসেছিলেন এই সেমিনারে।

মেলায় কলকাতায় ছাপা বইয়ের যত না বিক্রি, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি বিকিয়েছে চীন এবং সোভিয়েত দেশে ছাপা বাংলা আর ইংরেজি বই। এই দু দেশে ছাপা বই-ই দামে বেশ সস্তা আর ঝকঝকে। অজস্র ছবি পাতায় পাতায়। চীনা ড্রইং বুকের সেট-এর বিক্রিও ছিল যথেষ্ট বেশি।

প্রায় অনেক স্টলেই বই কিনলে বাচ্চারা পাচ্ছিলো কিন্তু খুচরো উপহার—পিসবোর্ডের টুপি, রঙিন বেলুন বা পেনসিল। মেলা হাঁটতে হাঁটতে খিদে তেষ্টা পেলে তা মেটাবারও জায়গা ছিলো। বোতলের ঠাণ্ডা পানীয়, কফি-চা এবং কিছু হাল্কা খাবার দাবার. তারপরই আবার শুরু করা হাঁটতে। বারো বছরের নিচে বাচ্চাদের ঢুকতে পয়সা লাগিনি।

ছোটদের জন্যে অজস্র সুন্দর বই নিয়ে হাজির ছিলেন শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ। প্রায় শুধু ছোটদের জন্যেই নানা ধরনের মণিমুক্তো ছেপে যাচ্ছেন ওঁরা। দে'জ পাবলিশিং-এও ছিলো ছোটদের অসংখ্য বই। আনন্দ পাবলিশার্স, কসমস, উদয় প্রকাশন আর আরও অনেকে হাজির ছিলেন ছোটদের বই নিয়ে। সোভিয়েত বই বিক্রি করছিলেন মনীষা, চীনা বই নিউ বুক সেন্টার। ছোটদের কাগজ শিশুমেলার স্টলে প্রায় সব সময়ই আড্ডা দিয়েছেন কিছু নবীন ছড়াকার, গল্প লিখিয়ে। ছোটদের বই যাঁরা ছাপেন না, এমন প্রকাশকও ছিলেন মেলার টেবল দখল করে।

বাচ্চাদের বসে আঁকার জায়গা ছিলো। ব্যবস্থা করা হয়েছিলো বিদেশী ফিল্ম দেখানোর।

তরুণ শিল্পী সমীর বিশ্বাস প্রতি বইমেলার মতো এবারও হাজির ছিলেন তাঁর 'পোর্ট্রেটস অফ ক্যালকাটা' (৩) নিয়ে। পেন এ্যাণ্ড ইঙ্কের ড্রইংয়ে চিড়িয়াখানা, বেলভেডিয়ার, জেনারেল পোস্ট অফিস, হাইকোর্ট, মেট্রোপলিটন ইনসিওরেন্সের বাড়ি, পুরনো কবরখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, জব চার্নকের সমাধির-মন্দির—সব কিছুই হয়ে উঠেছিল খুব জীবন্ত। পুরনো কলকাতার মুখকে এভাবে নিয়ে আসার জন্যে অবশ্যই ধন্যবাদ পাবেন শিল্পী।

দেখতে দেখতে কেটেছে ছোটদের বই মেলা। এখন সামনে দু দুটো বই মেলা—বড়দের এবং ছোটদেরও।

1এ, মুখার্জি পাড়া লেন কলকাতা-26

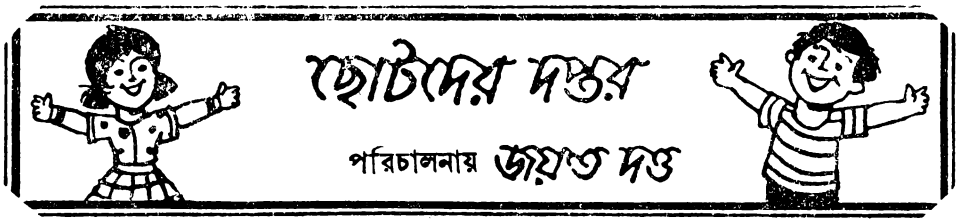

'নলেজ ক্যুইজ' ডিসেম্বর 83-এর দশ বা তার বেশি সঠিক উত্তরদাতাদের নাম

কলকাতা ঃ

সঞ্জয় কুণ্ডু, জয়ন্তী পাত্র, দীপালি মাইতি, কৃষ্ণা মাইতি, রীতা হালদার, টুকুন ঘোষ, প্রণব সরকার, সুপর্ণা সরকার, রুমকি সরকার, সুজিতকুমার পোদ্দার, প্রদ্যোৎ কাঞ্জিলাল, শুভেন্দু দাস।

24-পরগণা ঃ

উজ্জলকুমার বৈশ্য, অঞ্জন পান, সৌমিত্র মজুমদার, সোমনাথ ধারা, দীপক চক্রবর্তী, নির্মল মজুদমার, বিদ্যুৎ গুহঠাকুরতা, হেমন্ত দাস, শঙ্করপ্রসন্ন মুখার্জী, বিদ্যুৎ জ্যোতিষ, প্রদীপ্ত মিত্র, অর্পিতা ব্যানার্জী, অমর বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপককুমার নস্কর।

হাওড়া ঃ

মানসীরাণী রীত, তাপসকুমার রীত, অসিতবরণ রীত, প্রভাকর মান্না, দুলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

হুগলী ঃ

যমুনা শীল, অনুসীমা শীল, অভিজিৎ দত্ত, সমরজিৎ দত্ত, বিপ্লব ব্যানার্জী, অমিতাভ ব্যানার্জী, পবন, পীযুষ, কাজল ঘোষ, শুভ্রা মোদক, মিনতি মোদক, অনামিকা রাজ, সুব্রত মোদক ও অন্যান্য।

বর্ধমান ঃ

পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়, প্রেমাংশু, সুব্রত পালিত ও অন্যান্য, শিবেন্দ্রনাথ রায়, কনকেন্দু সিংহ, নিশার আখতর, সুবিমল ভট্টাচার্য, সুমন চক্রবর্তী, সুধাময় চক্রবর্তী, সুব্রত ঘোষ, রবিব্রত ঘোষ, অতীন মিশ্র, শ্রীরাম তেওয়ারী, বরুণকুমার রেজ, সুধীন্দ্রনাথ রায়।

মেদিনীপুর ঃ

উত্থানপদ বর্মণ, তাপসী চক্রবর্তী, আশিস চক্রবর্তী, কিংশুক হালদার।

নদীয়া ঃ

সুজিতকুমার খাঁ, কানু ও বাসুদেব পাকড়াশী, উদয়ভানু ঘোষাল, পিণ্টু চক্রবর্তী, গোপাল চক্রবর্তী, লিণ্টু চক্রবর্তী, প্রবীর চক্রবর্তী, শান্তনু চক্রবর্তী।

বীরভূম ঃ

বামদেব সরখেল, দীপনারায়ণ দত্ত, প্রিয়ঙ্কা দত্ত, সুদীপ্ত দত্ত, রাজা ঘোষ, শম্পা সিনহা, চন্দন সিনহা তন্ময় চৌধুরী, দিলারা বেগম, আয়েসা বেগম।

বাঁকুড়া ঃ

শ্যামসুন্দর সাহা, চন্দনা সাহা।

পুরুলিয়া ঃ

তাপস বসাক, সলিল, পাল, সুস্মিতা ঘোষ, জয়দীপ পাল, সুব্রত, পাপিয়া শান্তনু ও সুপ্রভাত সেনগুপ্ত।

মুর্শিদাবাদ ঃ

এমদাদুল হক, বিবেকানন্দ সরকার, সঞ্জীর সরকার, স্বাতী সরকার, চিন্ময় মুখোপাধ্যায়, শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, অভিজিৎ দে, দিব্যেন্দু রায়, পলাশ মহান্ত, বিকাশ মহান্ত, মানস মহান্ত।

কোচবিহার ঃ

অর্পিতা ভট্টাচার্য, সুপর্ণা ও দীপঙ্কর চৌধুরী।

মালদা ঃ

দেবব্রত রায়, শোভন আচার্য, পূর্ণেন্দু নন্দী, সুপ্রতিম দাস, দীপঙ্কর সরকার, অরূপ দাস।

শব্দকূট

সৌমিত্র মজুমদার

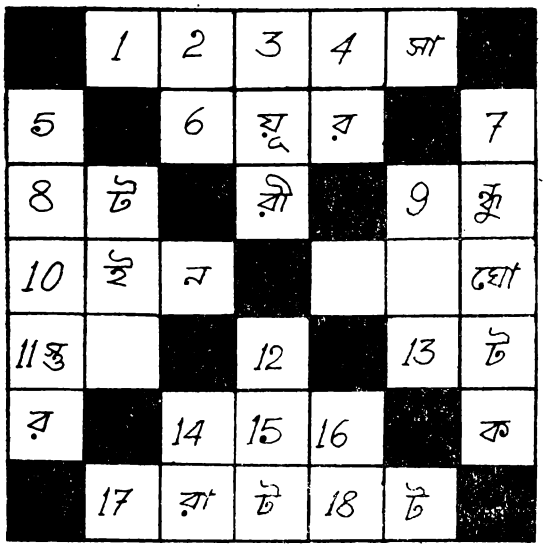

পাশাপাশি :-

1. কাণ্ডহীন উদ্ভিদ, পাতা কণ্টকময়, 3. সাপেদের অধিপতি দেবী (জরৎকারুমুনি'র স্ত্রী), 6. আমাদের জাতীয় পাখী, 8. বাড়ী তৈরীর বিশেষ সামগ্রী, 9. একটি নদের নাম, 10. শঙ্খ-আকৃতি গাছের নাম, 11. কথা'র আরেক নাম, 13. ইংরেজী ভাষায় ছাগলের নাম, 17. যে বিশেষ এককে সোনা মাপা হয় (তিন অক্ষরের নাম), 18. শীতকালে গায়ে পরার বস্ত্র বিশেষ।

উপর-নীচ :

2. তেতো গাছ বিশেষ, 3. মেয়ে ময়ূর-কে যা বলে সবাই সংক্ষেপে, 4. মানুষের-ই এক নাম, 5. যে প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী জলাতংক রোগের প্রতিষেধক 'সিরাম' আবিষ্কার করেছিলেন, 7. লুপ্তপ্রায় প্রাণী (জলে সাঁতার কাটতে পটু), 9. এক শহরের নাম-যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ গেছিলেন, 12. স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র-মানব, 14. পারদের সংক্ষিপ্ত নাম, 15. নৌকা'র ইংরাজী কথা, 16. উড়ন্ত-ছুটন্ত টিকটিকির অন্য এক বিশেষ ধরণের নাম।

73, পূর্বাচল কলোনী ; রহড়া, 24-পরগণা।

পাইরিথিঅক্সিন

শুভাশিস ঘোষ

বিজ্ঞানীরা আজ এমন একটি ভিটামিন উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন যার সহায়তায় স্মৃতিভ্রংশ, মাথাধরা, অনিদ্রা ও বুদ্ধিলোপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সম্ভব। ভিটামিনটার নাম—পাইরিথিঅক্সিন। এই ভিটামিন সম্পর্কে পশ্চিম জার্মানীতে ব্যাপকভাবে গবেষণা করা হচ্ছে, এ পর্যন্ত গবেষণাগার থেকে বেশ আশাপ্রদ ফলই মিলেছে। এবার ঐ ভিটামিন সম্বন্ধে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা বলা যাক্। 72 বছরের একজন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষকের উপর ছয় সপ্তাহ ধরে এই পদার্থটি দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছিল। চিকিৎসার আশাপ্রদ ফল হিসাবে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং পুনরায় শিক্ষকতার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। এছাড়া মাথায় সাংঘাতিক ভাবে চোট খাওয়া তিনজন রোগীকেও এই ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছিল। এবং মাত্র 2 সপ্তাহের মধ্যেই তাদের যন্ত্রণার সম্পূর্ণ উপশম হয়, সুস্থ মানুষের মতই আবার কর্মক্ষমতা ফিরে পায়। বিজ্ঞানীরা জানতেন যে মানুষের মস্তিষ্ক গঠনের জন্য ভিটামিন—বি-6 একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। পাইরিথিঅক্সিন গ্লুকোজ ও সোডিয়াম সরবরাহ করে মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষে। এই পদার্থ দুটি রক্তের প্রবাহের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পুষ্টি দান করে। মস্তিষ্কের আবরণীকে ওষুধের সহায়তায় শক্ত কিংবা নরম করা যেতে পারে। নরম হলে মস্তিষ্কে কোনো কিছু পৌঁছাতে পারে। ভিটামিন বি-6 এই আবরণী ভেদ করে মস্তিষ্কে পুষ্টিকর পদার্থ পাঠিয়ে দেয়। প্রথমে পশুর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছিল, পরে হয় মানুষের দেহে।

এই ভিটামিনের সাহায্যে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর উপকার করা সম্ভব কিনা সেই বিষয়ে বর্তমান পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল খুবই আশাপ্রদ।

গ্রাম + পোঃ কেশবপুর, জেলা হুগলী

ভেবে ভেবে বল—উত্তর

1. (ক) স্প্যানিয়েল (খ) বিগ্‌ল (গ) বুলডগ 2. লভয়সর 3. অক্সিজেন 4. ইথার 5. ম্যাগমা আগ্নেয়গিরির ফুটন্ত লাভা 6. VOCAL CORD [কণ্ঠনালী] 7. এক ধরনের মাছ 8. লিস্টার 9. ডোডো [DODO] 10. 10—15 ফুট।

জলার আত্মা

রীতা রায়

ফুটবল খেলা শেষে বাড়ি ফিরছিল তপেশ আর ফটিক। খেলা হয়েছিল পলাশপুরের সঙ্গে গোবরডাঙ্গার। ওদের গ্রাম পলাশপুর থেকে গোবরডাঙ্গার দুরত্ব প্রায় মাইলখানেক। পলাশপুরের হয়েই খেলেছিল ওরা এবং জয় হয়েছিল ওদেরই। ওদের ক্যাপ্টেন খেলা শেষে কিছু খাওয়াদা-ওয়ারও ব্যবস্থা করেছিল। কাজেই সবশেষে ওরা যখন বাড়ীর দিকে রওনা হল তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে।

এদিকে কখন যে আকাশে মেঘ করে এসেছে তা দুজনের কারোরই খেয়াল ছিল না। যখন খেয়াল হল তখন দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। গ্রামে প্রবেশ করার মুখে বৃষ্টির বেগ আরও বাড়ল। চারদিকে অন্ধকার। অনেক দূর থেকে ফটিকের চোখ পড়ল গ্রামের বড় জলাটার উপর। জলাটার পিছন দিকে বাঁশবন। রাতের বেলা এদিকটা আসতে অনেকেই ভয় পায়। ওদের গ্রামের ক্ষ্যান্তমণি বেশ কিছুদিন আগে এখানে গলায় ফাঁস ঝুলিয়েছিল। তারপর অনেকেই নাকি তার আত্মাকে এখানে দেখেছে।

হঠাৎ ফটিকের চিৎকারে সম্বিৎ ফিরে পেল তপেশ। দৃষ্টি প্রসারিত করতেই দৃষ্টি গেল জলার একধারে। ভয়ে দুজনেই হিম হয়ে গেল। মুখ দিয়ে কথা বের হল না কারোরই। একটা বড় আগুনের গোলা ডোবার দিক থেকে সরাসরি ওদের দিকে ছুটে আসছে। কিছুটা আসার পর গোলাটা পিছন দিকে যেতে লাগল। তারপর হঠাৎ ওরা আর গোলাটাকে দেখতে পেল না। তপেশই প্রথম কথা বলল, ক্ষ্যান্তমণির আত্মা রে, চল দৌড়োই।

কতক্ষণ ছুটেছিল কারোরই খেয়াল ছিল না। খেয়াল হল যখন ওরা বাড়ীর কাছে এসে গেছে। এদিকে ওদের দেরি দেখে বাড়ীর লোকেরা লণ্ঠন হাতে খুঁজতে বের হয়েছে। বাড়ীর লোকদের দেখে ওরা কিছুটা সাহস পেলেও মুখে কথা নেই কারোর। শেষ পর্যন্ত ফটিকই কোন রকমে বলল 'জলার ধারে ক্ষ্যান্তমণির ভূত'। ওদের ছোটমামা কলকাতায় পড়াশোনা করেন। কয়েকদিন হল গ্রামে এসেছেন। সব শুনে তিনি জায়গাটা দেখতে চাইলেন। কিন্তু দুজনের কেউই যেতে রাজী নয়। অনেক বলার পর দুজনে রাজী হল। নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে ওরা আবার দেখতে পেল আগুনের গোলা। এবার গোলাটি হঠাৎ নিবে গেল দপ্ করে। দুজনেই ভয়ে কাঠ। হঠাৎ ছোটমামা হো হো করে হেসে উঠলেন। দুজনেই অবাক। ওদের দিকে চেয়ে ছোটমামা বললেন, 'আরে ওতো আলেয়া।' প্রাণী দেহের পচনের ফলে উৎপন্ন হয় সহজদাহ্য অর্থাৎ সহজেই জ্বলে এমন দুটি গ্যাস, ফসফিন ও ফসফরাস ডাই-হাইড্রাইড। আর জলা জায়গায় উদ্ভিদজাতীয় পদার্থের পচনের ফলে উৎপন্ন হয় জলা গ্যাস। এই জলা গ্যাসের নাম মিথেন। এই গ্যাস আপনা আপনি জ্বলে না, খানিকটা ফসফরাস ডাই-হাইড্রাইড উৎপন্ন হয়ে বায়ুর সংস্পর্শে আসে গ্যাস নিজেই জ্বলে ওঠে। এই সময় ফসফিন এবং জলা গ্যাসের মিশ্রণটি মুহূর্তে জ্বলে উঠে এবং অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। রাতের অন্ধকারে এই আগুন অনেক দূর থেকে দেখা যায়। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেও এটা দেখা যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত গ্যাস মিশ্রণটি এক সময় জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যায়। এই পর্যন্ত বলে ছোটমামা থামলেন। বিজ্ঞানের বিচিত্র সৃষ্টির কাছে পরাজিত হয়ে তপেশ ও ফটিক দুজনেই নিশ্চুপ।

মিলনপাড়া, রায়গঞ্জ, পঃ দিনাজপুর

নিজে নিজে কর

স্লিপব্রেকিং বেল

তাপসকুমার দাস

অনেক ছাত্রের একটি সমস্যা দেখা যায় যে রাত্রে ঘুম ভাঙে না। তাদের হয়তো রাত থেকে পড়াশোনা করা দরকার। কিন্তু ঘুম ভাঙছে না। যদি ওপরের যন্ত্রটি একদিন নিজে বসে তৈরী করা যায় তবে ওর সাহায্যে আমাদের প্রতিদিন ঘুম ভাঙতে পারে। এ যন্ত্র তৈরী করতে হলে প্রথমে কিছু জিনিষ জোগাড়ের প্রয়োজন আছে।

(1) একটি নলসহ সেলাইন বোতল, (2) একটি কলিংবেল, (3) একটি ছিদ্রযুক্ত কাচের টিউব বা একটি বড় প্লাস্টিকের গ্লাস, (4) একটি রবার নল, (5) একটি প্লাস্টিক অথবা কাঠের বাটি ইত্যাদি।

এবার হল যন্ত্র তৈরীর পালা, প্রথমে আমাদের বোতলের ভেতর দুটি রবার নল প্রবেশ করাতে হবে। এদের একটিকে (c) একেবারে ছিপির ভেতর দিয়ে বোতলের তলা পর্যন্ত ঢোকাতে হবে। আর দ্বিতীয় নলটিকে (d) বোতলের মুখ পর্যন্ত ঢোকাতে হবে। d সেলাইন নলের অপরপ্রান্ত ছিদ্রযুক্ত গ্লাস বা নলের ওপর ঝুলিয়ে দিতে হবে। এবার গ্লাস বা নলের ছিদ্রের ঠিক নীচে একটি প্লাস্টিক বা কাঠের বাটিকে বসাতে হবে। এখন বাটির বিপরীত দুইদিকে দুটি ছোট ছিদ্র করে দুটি তামার তারের কিছুটা প্রবেশ করাতে হবে যাতে ঐ তার দুটো বাটির ভেতরে পরস্পর না লেগে যায়, ওদের মধ্যে যেন কিছুটা ফাঁক থাকে। এবার বাটির মধ্যে কিছুটা খাদ্য লবণ (Nacl) নিতে হবে। এবার ঐ তারের দুই প্রান্তকে ব্যাটারী ও কলিংবেলের সঙ্গে যোগ করতে হবে। ব্যাস যন্ত্র প্রস্তুত। এবার শিশিতে কিছুটা ($\frac{2}{3}$ ভাগ) জল নিয়ে শিশিকে উলটে দেওয়ালে ঝুলিয়ে দিতে হবে। c নলটিকে এমন ভাবে বোতলের সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে যাতে ওর খোলা মুখটি বোতলের ওপরে থাকে এবং d নলকে বোতলের সাথে এমন ভাবে বাঁধতে হবে যে উহার 'K' প্রান্তটি বোতলের যে দাগ পর্যন্ত থাকবে সেই দাগ থেকে বোতলের মুখ পর্যন্ত জলের আয়তন 'S' নলের ছিদ্র থেকে তলা পর্যন্ত জলের আয়তনের চেয়ে কিছুটা বেশী হবে। এখন

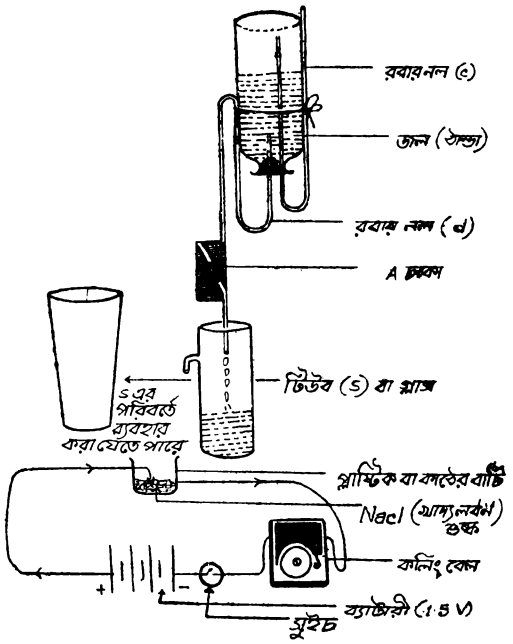

স্লিপব্রেকিং বেল

নলের 'T' প্রান্ত দিয়ে বিন্দু বিন্দু জল 'S' টিউবে পড়বে। পড়তে পড়তে যখন কাটা মুখ পর্যন্ত আসবে তখনই জল 'R' বাটিতে পড়বে। জলের সংস্পর্শে লবণ (Nacl) আয়নিত হবে, ফলে তড়িৎবর্তনী সংহত হবে। তার ফলে কলিং বেল বাজতে থাকবে।

এখন কথা হল এটা কি যখন তখন বাজবে? না, এটা যখন তখন বাজবে না। ধরা যাক কেউ রাত্রি 9টার সময় ঘুমিয়ে 3টার সময় উঠতে চায়। তাহলে ব্যবধান 6 ঘণ্টা অর্থাৎ 360 মিনিট। এখন যদি 'S' টিউবে (ছিদ্র পর্যন্ত) 10800 ফোঁটা জল ধরে (180 টি হোমিওপ্যাথি ছোট শিশিতে যা জল ধরে কারণ একটি শিশিতে 60 ফোঁটা জল ধরে) তবে দেখতে হবে যে 360 মিনিটে 10800 ফোঁটার কিছু বেশী জল ফেলতে হবে। অতএব, প্রতি মিনিট জল থেকে 30 ফোঁটার কিছু বেশী করে জল টিউবে ফেলতে হবে। এই ফোঁটা ফেলা কম বেশী করা যাবে 'A' চাকা ঘুরিয়ে। এই ভাবে কখন ঘুমাবে কখন উঠবে উহাদের ব্যবধান ঠিক করে একটা চার্ট তৈরী করে রাখলে কাজের সুবিধা হবে।

বনমালীচট্টা হাইস্কুল, পোঃ-বনমালীচট্টা, মেদিনীপুর।

ইলেক্‌ট্রিক ফিস

বিশ্বজিৎ সরকার

তোমরা সকলেই জানো মাছ বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। মাছ না হলে নাকি বাঙালীদের ভাত ওঠে না। অবশ্য মাছ শুধু বাঙালীর খাদ্য নয়। পৃথিবীর বহু মানুষই মাছ খেয়ে থাকে। মাছ যে শুধু খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় তা নয়। বহু মাছ আছে যেগুলো খুবই বিষাক্ত।

এছাড়া আর এক ধরনের মাছ আছে যাদের দেহে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। তোমরা হয়তো অবাক হচ্ছ, তাই না?—মাছ আবার বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে! হ্যাঁ সত্যিই মাছের দেহ থেকেও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। অবশ্য এই বিদ্যুৎকে মাছেরা শত্রুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে এবং নিজের শিকার ধরার কাজে লাগায়।

বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী মাছগুলিকে সাধারণভাবে বলা হয় 'বৈদ্যুতিক মাছ'। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক মাছ দেখা যায়। এখানে আমি দুটি মাছের সম্বন্ধে বলব। 'ইলেকট্রিক ইল' বা 'বৈদ্যুতিক বাণ মাছ' ও 'ষ্টার গেজার'।

(1) ইলেকট্রিক ইল—বিরাট আকৃতির এই বৈদ্যুতিক মাছটিকে দক্ষিণে আমেরিকার সমুদ্রে দেখা যায়। আট-দশ ফুট লম্বা এই মাছটির ওজন কমপক্ষে 15/20 কেজি.। তবে বুঝতেই পারছো কি বিরাট মাছ। দেখতে অনেকটা সাপের মত। গায়ের রঙ অনেকটা ছাইয়ের মত। মাথার নীচের দিকটা লালচে রঙের। দেহের তুলনায় চোখ ছোট।

তড়িতের যেমন নেগেটিভ (ঋণাত্মক) ও পজিটিভ (ধনাত্মক) দুই রকমের আধান থাকে তেমনি ইলেকট্রিক ইল-এর মাথায় পজিটিভ এবং লেজে নেগেটিভ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই বিদ্যুতের পরিমাণ 300 ভোল্ট। আমাদের বাড়ীতে যে বিদ্যুৎ আছে; যার সাহায্যে আমরা লাইট, ফ্যান, হিটার, ইস্ত্রি প্রভৃতি চালাই বা ব্যবহার করি,—তার পরিমাণ থাকে 220 থেকে 230 ভোল্ট। কাজেই এই মাছ লেজ ও মাথা দিয়ে যদি এক সঙ্গে কোন প্রাণীকে স্পর্শ করে, তবে তার মৃত্যু অবধারিত।

(2) ষ্টার গেজার—এর বাসস্থান আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর। এরা অগভীর জলেই থাকে। এই মাছের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। যা দেখে একে সহজে সনাক্ত করা যেতে পারে। ষ্টার গেজারের চোখ দুটি ঊর্ধ্বদিকে প্রসারিত। এই দুটি চোখে কি আছে জানি না; তবে এই দুটি চোখই ষ্টার গেজারের শিকার ধরার মত ফাঁদ। সমুদ্রের প্রাণীরা এর চোখ দেখে আকৃষ্ট হয় আর তখন শিকার মৃত্যু কবলিত হয়।

ষ্টার গেজারের চোখ দুটিই বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র। একটি চোখে নেগেটিভ ও অপরটিতে পজিটিভ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। সামুদ্রিক প্রাণীরা যখন ষ্টার গেজারের চোখ দেখে মোহিত হয়ে পড়ে, তখনই ষ্টার গেজার অতর্কিতে আক্রমণ করে এবং বৈদ্যুতিক শক্ দিয়ে শিকারকে ঘায়েল করে ফেলে।

এই দুই ধরনের বৈদ্যুতিক মাছ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক মাছ দেখা যায়। কোন কোনটার বিদ্যুতের পরিমাণ অনেক বেশী।

শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রত্যেক প্রাণীরই কোন না কোন অস্ত্র থাকে। কিন্তু বৈদ্যুতিক মাছেদের আত্ম-রক্ষার কৌশলটা অন্য ধরনের, তাই নয় কি!

কিন্তু মানব জাতির কাছে পৃথিবীর সকল প্রাণীই পরাজিত হয়। এই বৈদ্যুতিক মাছেরাও মানুষের হাত থেকে রেহাই পায়নি। বৃটেন, স্পেন ও পর্তুগালের লোকদের এবং আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের কাছে এইসব মাছ নাকি খুবই সুস্বাদু খাদ্য।

31, ডাঃ মেঘনাদ সাহা রোড, দমদম, কলিকাতা-74

ডিসেম্বরের শব্দকূটের সমাধান

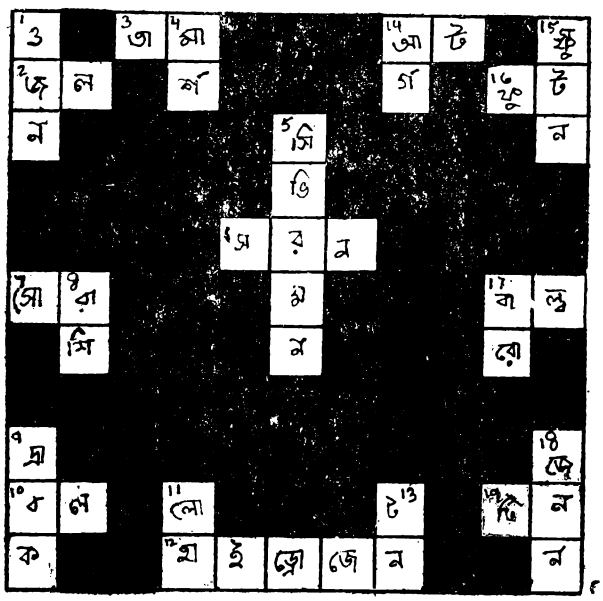

নলেজ ক্যুইজ

1. চিকিৎসকের প্রেসক্রিপসনে b, d, p, c লেখা থাকলে কি বোঝায় ?
2. কর্ণাটকের ইস্পাত নগরীর নাম কি ?
3. কোন্ সালে 'আইফেল টাওয়ার' নির্মিত হয়েছিল ?
4. বর্তমান জিম্বাবোয়ে রাষ্ট্রের পূর্ব নাম কি ছিল ?
5. সুয়েজ খালের দৈর্ঘ্য কতো ?
6. 'প্রন্টোসিল'-এর আবিষ্কর্তা কে ?
7. Elia ছদ্মনামে গ্রন্থ রচনা করতেন কে ?
8. ভারতের প্রাচীনতম ফুটবল সংগঠন কোন্‌টি ?
9. ভারতে যে ত্রিমূর্তি পূজিত হন, তাঁরা কে কে ?
10. পার্শি ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা কে ?
11. কোন্ দেশে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ইহুদী বাস করেন ?
12. কতো সালে 'জুডো' খেলা অলিম্পিক ক্রীড়ার অন্তর্ভুক্ত হয় ?
13. সূর্যের উষ্ণতা মাপা হয় কোন্ যন্ত্র দ্বারা ?
14. শকাব্দের প্রচলন করেছিলেন কে ?
15. সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের 156 তম সদস্য রাষ্ট্র কোন্‌টি ?

ডিসেম্বর সংখ্যার নলেজ ক্যুইজ-এর সমাধান

1. চাওেল 2. আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বর্ষ 3. বাল গঙ্গাধর তিলক 4. শ্রীঅরবিন্দ 5. অ্যালুমিনিয়াম শিল্প 6. গুজরাট 7. প্রশান্ত মহাসাগর 8. 1957 সাল থেকে 9. 64টি 10. লিরা 11. মিথেন 12. লেড 13. প্রাণি 14. যকৃৎ 15. পালং শাক।

জেনে রাখ

চন্দন রুদ্র

1. যে মাছ গাছে বাসা বাঁধে—

এই মাছের নাম স্কিপ্ডল, এদের দেখতে অনেকটা কই মাছের মতো, এরা কানকোয় ভর করে জলাশয়ের ধারে ছোট ছোট গাছে ওঠে এবং জলের শেওলা ও ঘাস-কুটো দিয়ে গাছের ডালে বাসা বাঁধে এবং ডিম পারে।

2. পাখির মতো বাসা বাঁধে যে বানর—

বোর্ণিও ও সুমাত্রা অঞ্চলে ওরাংউটান শ্রেণীর এক ধরণের বানর দেখতে পাওয়া যায়, এরা বনের ঝোপঝাড়, গাছের ডালপালা ভেঙ্গে নিয়ে গাছের ওপর সুন্দর করে পাখির মতো বাসা তৈরী করে। এদের হাত খুব লম্বা হয়, উচ্চতায় এরা চার থেকে সওয়া চার ফুট। এদের শরীরের ওজন প্রায় 150 পাউণ্ডের মতো।

3. পাখি খায় যে মাকড়সা—

সাধারণতঃ আমরা জানি যে পাখিরাই মাকড়সা ধরে খায়। কিন্তু ব্রাজিলের জঙ্গলে এক ধরনের খুব বড় মাকড়সা দেখতে পাওয়া যায়। এই মাকড়সাগুলি ছোট ছোট পাখি, ইঁদুর, গিরগিটি প্রভৃতি ধরে খায়।

4. সব চাইতে ভয়ঙ্কর পিঁপড়ে—

আফ্রিকার জঙ্গলে এক ধরনের পিঁপড়ে দেখা যায়, এরা ড্রাইভার-অ্যান্ট নামে পরিচিত। এই পিঁপড়েগুলি খুব সাহসী ও শিকারী। এরা যখন দল বেঁধে জঙ্গলে বের হয় তখন জঙ্গলের সব প্রাণী পালাতে থাকে। কেননা এদের সামনে কোন প্রাণী পড়লে এরা ঐ প্রাণীটিকে ছেকে ধরে এবং আক্রমণ চালায়। বন্য প্রাণীদের কাছে এরা খুবই ভয়ংকর।

5. ঘুম রোগ –

আফ্রিকার বন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে এক ধরণের রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এই রোগকে ঘুম রোগ (sleeping sickness) বলা হয়। এই সব অঞ্চলে ৎযেৎসি (tsetse) নামক এক জাতীয় মাছির কামড়ে এই রোগের উৎপত্তি। ৎযেৎসি ঘোড়া-মাছি জাতীয় মাছি। এই রোগের প্রধান লক্ষণ হল, রোগী সব সময় ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন থাকার মতো অসাড় হয়ে পড়ে থাকে। নিয়মিত চিকিৎসার ব্যবস্থা না হলে কিছুদিন ঐ অবস্থায় থাকতে থাকতেই রোগীর মৃত্যু ঘটে।

6. সব থেকে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়া গাছ—

লাইকেন (lichen) নামে এক জাতীয় গাছ আছে। এই গাছ পঞ্চাশ বছরে মাত্র একহাত বৃদ্ধি পায়। তবে এই গাছ প্রায় দুশো বছর বাঁচে।

বাঁশদ্রোণী পেয়ারা বাগান, বাঁশদ্রোণী, 24 পরগণা।

ভেবে ভেবে বল

শুভব্রত রায়চৌধুরী

1. নীচে তিনটি কুকুরের মুখ-এর ছবি আছে। এদের নামগুলো ভেবে বল।

ক

খ

গ

2. নীচের ছবিটি একজন বিদেশী বৈজ্ঞানিকের। ইনি 26শে আগস্ট 1743 সালে প্যারিসে জন্মেছিলেন। এর নামটি ভেবে বল।

3. উপরের বৈজ্ঞানিক একটি জনপ্রিয় গ্যাসের সন্ধান করেছিলেন। এর নাম বল।

4. অস্ত্রপ্রচার করবার সময় ক্ষত স্থানকে অসাড় করবার জন্য এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থের আবিষ্কার করেছিলেন মাইকেল ফ্যারাডে, 1820 সালে এর নাম বল।

5. নীচের কোন বাক্যটি ঠিক ভেবে বল।

(ক) ম্যাগমা একটি রাসায়নিক প্রোটিন।

(খ) 'ম্যাগমা' ম্যাগনেসিয়াম থেকে নির্গত গ্যাস।

(গ) ম্যাগমা আগ্নেয়গিরির ফুটন্ত লাভা।

6. নীচের ছবিটি কিসের ভেবে বল।

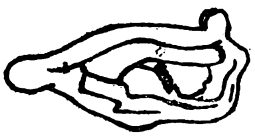

7. একটি ছেলেকে প্রশ্ন করা হয়, 'সামুদ্রিক ঘোড়া কি?' সে উত্তর দেয়, 'সমুদ্রের মধ্যে বাস করে যে ঘোড়া' এই উত্তরটি ঠিক কিনা ভেবে বল?

8. জীবাণুমুক্ত অস্ত্রপ্রচারের জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন

(ক) হামফ্রে (খ) ভোল্ট (গ) লিস্টার।

9. নীচের ছবিতে একটি পাখিকে দেখান হয়েছে।

বহু বছর আগে মাদাগাসকারের পূর্ব দিকে এবং ভারত মহাসাগরের দ্বীপে এদের বাস ছিল। এর নাম বল।

10. লেজের উপর ভর দিয়ে ক্যাঙারু কতো ফুট পর্যন্ত এক সঙ্গে লাফাতে পারে, ভেবে বল।

---

10. ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলিকাতা-8

ডিসেম্বর সংখ্যার ভেবে ভেবে বল—উত্তর

1. ক্রেসকোগ্রাফ 2. ফাদার লা ফন্ট 3. ডাক্তারী পড়তে 4. ফ্যারাডে ও ডেভি 5. 1898 6. উদ্ভিদের সাড়া; তুলনা মূলক বৈদ্যুতিক শরীরবৃত্ত 7. মারকনি 8. (ক) ফাইটোগ্রাফ; (খ) অপটিক্যাল স্কিগ্‌মোগ্রাফ (গ) রেজোনান্ট রেকর্ডার

হাবুলের বিজ্ঞান-ভাবনা
ধীরেন বল
জল দূষণ
ছোট বেলায় স্বাস্থ্যের বইতে এমন দৃশ্য বহু দেখেছি !
ঘড়া করে খাবার জল নিয়ে যাচ্ছে!
বাড়ীতে হয়তো পাতকো নেই, তাইতে—.
পাতকোর নমুনাও এই! পাশেই নোংরা নর্দমা—
চুঁইয়ে ওই সব পাতকোয় জমে!
টিউবওয়েলেরও রেহাই নেই!
অগভীর হলে সাক্ষাৎ নরক; প্রাণ নিয়ে টানা টানি সবার!
পাশের নোংরা তলায় জমা হয়, আর পাম্পের সাথে উঠে আসে।
তাহলে উপায়টা কী? নদী?
নদীকে আমরা নোংরা ফেলার নর্দমা মনে করি —
আজকাল ফের নদীর নতুন উপসর্গ জুটেছে!

পত্রপ্রেরকদের কাছে অনুরোধ

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের দপ্তরে দৈনিক প্রচুর চিঠি আসে।
সে সব চিঠির বিষয়বস্তুও ভিন্ন ভিন্ন। কেউ বা লেখা পাঠান,
কেউ বা অন্য কিছু। আবার লেখাও ত নানা রকমের।
কেউ পাঠান ছোটদের দপ্তরে প্রকাশের জন্যে।
আবার অনেকে লেখা পাঠান সাধারণ বিভাগে প্রকাশের জন্যে।
লেখা ছাড়াও প্রকাশিত বিষয়ের উপরে অনেকে আলোচনা
করে চিঠি পাঠান, যেগুলি 'চিঠি পত্র' বিভাগে প্রকাশিত হয়।
কেউ বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা রকম প্রশ্ন করে পাঠান—
যার উত্তর ছাপা হয় 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগে। এই
সমস্ত চিঠি খুলে পড়ে বিভিন্ন দপ্তরে পাঠিয়ে প্রয়োজনীয়
ব্যবস্থা নিতে অনেক দেরি হয়ে যায়।
তাই কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে
আমাদের অনুরোধ তারা যেন চিঠি বা খামের উপরে বিষয়টি
পরিষ্কার ভাবে লিখে দেন। যেমন:
এক কি ধরনের লেখা : ছড়া, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি।
দুই সংশ্লিষ্ট বিভাগের উল্লেখ করা বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা, প্রশ্নোত্তর,
নিজে কর বা ছোটদের দপ্তর ইত্যাদি।
তিন : সাধারণ চিঠিপত্রের ক্ষেত্রে 'চিঠিপত্র' এবং কোন নির্দিষ্ট
বিষয়ের চিঠি হলে সেই, বিষয়ের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
যেমন, 'ঘনাদা ক্লাব' ইত্যাদি।
চার : আমন্ত্রিত রচনা বা প্রতিযোগিতামূলক রচনার ক্ষেত্রে সেই
বিষয়ের উল্লেখ খাম বা চিঠির উপরে থাকা প্রয়োজন।
আশা করি কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা
আমাদের সহযোগিতা করবেন।

—সম্পাদক

R/No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN 3rd year • Jan. 1984 Regd No WBCC/50

সচিত্র জ্ঞানবিজ্ঞান

অমরনাথ রায়
সংখ্যা নিয়ে খেলা ৮·00

সমরজিৎ কর
নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ১৫·00 সমুদ্রের সম্পদ ৮·00

অমরনাথ রায়
জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা ৫·00

অরূপরতন ভট্টাচার্য
রোবোট এল কেমন করে ৬·00

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার ৬·00

অমরনাথ রায়
সায়েন্স ক্যুইজ ১০·00

সিদ্ধার্থ ঘোষ
স্যাম লয়েড ও ল্যুইস ক্যারোলের ধাঁধা ১০·00
অঙ্কের ম্যাজিক খেলার লজিক ৬·00

বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞানের গল্প

লীলা মজুমদার
কল্পবিজ্ঞানের গল্প ১৫·00

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
লুপ্তধন ৮·00 মেঘনাদ ১০·00

অদ্রীশ বর্দ্ধন
কিশোর সায়েন্স ফিকশ্যান ১৫·00

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
তুষারলোকের রহস্য ৮·00

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ • ৮/১এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট, কলকাতা–৭০০০৭৩

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত
এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম তিন টাকা
প্রচ্ছদমুদ্রণ রূপসা এন্টারপ্রাইজ, ২০০ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ১২